একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে

তা. র.১৭—১১

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়

গৌরবাস্পদেষু—

আপনি গুণী—প্রতিভাশালী গুণী শিল্পী। বাংলা ও ভারতবর্ষের জন্য পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের অভিনন্দন বহন করে এনেছেন। দেশ আপনাকে অভিনন্দিত করেছে। জীবনের অপরাহ্ণে আমিও আপনাকে অভিনন্দন জানাই। ইতি—

২১ ৯।৬৩

সমস্তটাই চোখের উপর ঘটছিল; আনন্দ চোখ মেলে দেখার জন্যই দেখছিল। সেই চোখ চাওয়া অবস্থাতেই চোখের উপরেই কি এসে পড়ল ঝপ করে। ঠিক নাক এবং ডান চোখের সংযোগস্থলে। বেশ বড় একটা কিছু। তাতে যেন কাঁটা আছে। এবং সবেগে এসে পড়ল। কয়েকটা কাঁটা যেন চোখে বিঁধে গেল আনন্দর। পিনকুশনের মত একটা জিনিস—পিনের ডগাগুলি যেন বেরিয়ে আছে। আনন্দ আকস্মিক আঘাতে শুধু চমকেই উঠল না, একটা ক্রুদ্ধ এবং কাতর চীৎকার ক'রে উঠল—ওঃ।

রবিবার দিন বিকেল বেলা, প্রায় পৌনে চারটে। চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, শীত গেছে, গরমের আমেজ উঠেছে, দুপুরে ঘুমুতে ভাল লাগছে কিন্তু রৌদ্রের জ্বালা বা তাপ এখনও কোটেনি। তবুও গ্রীষ্ম-দুপুরে যে একটা অমথমে ভাব ওতে পেট দেখা দিয়েছে; সেইটে কাটছে এখন। পাখীগুলো বাইরে কলকল করতে শুরু করেছে, দুপুরের ঝিমুনি কাটিয়ে উড়তে শুরু করেছে। ইলেকট্রিকের তারের উপর কয়েকটা কাক তারস্বরে কা কা ডাক ধরেছে। কয়েকটা শালিক কিচির মিচির করছে। আর চড়ুইয়ের দল ফুর ফুর করে উড়ছেই উড়ছেই।

কলকাতার বাইরে—আগে শহরতলী বলা চলত, কিন্তু এখন শহরের সামিলই। ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নতুন স্কীমে নতুন শহরই গড়ে উঠেছে, মধ্যখানে একটা পার্ককে বেড় দিয়ে মসৃণ রাস্তার পাশে পাশে নতুন বাড়ি। বালিগঞ্জ রাসবিহারী অ্যাভিনুর মত সবগুলোই বড় বাড়ি নয়, ছোট বড় মাঝারি একতলা ছোট বাড়ি থেকে চারতলা বাড়ি, খান-দুই পাঁচতলা বাড়িও উঠেছে। এরই মধ্যে ছোট একখানা একতলা বাড়ির ভাড়াটে আনন্দ। বাড়িটা একতলা এবং ছোট হলেও ফ্যাশনে কায়দা-কেতায় খাটো নয়। সব থেকে বিশেষত্ব বাড়িটার জানালা। আটফুট-চারফুট একটা জানালা দক্ষিণের দেওয়ালে এবং তারপরই পঁচিশ ফুট রাস্তা, তার ওপারে পার্ক। পার্কের চারিদিকে দেবদারু গাছের সারি। দু-চারটে শিমুল জাতীয় গাছ। সব মিলিয়ে শহর এবং পল্লীর মুক্ত আকাশ ও মাটিতে গাছপালার মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে একটি মেশামেশি আছে। গাছপালার মধ্যে পাখী—সে শকুন থেকে চড়ুই পর্যন্ত। কীট-পতঙ্গও যথেষ্ট। মশার তো কথাই নেই, রাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে ভোঁ করে গুবরে পোকা ঘরে ঢুকে মাথা ঠুকে ঠক করে মেঝেয় যখন পড়ে তখন আনন্দকে চমকে উঠতে হয়। এ পর্যন্ত দুখানা ছবি তার একদম বরবাদ হয়ে গেছে। চমকানিতে হাতের তুলি লাফিয়ে এমন বেমক্কা রঙের টান মেরে দিলে যে—তাকে আর কিছুতেই শোধরানো গেল না। শোনা যায় সাপও আছে। কোণে—অর্থাৎ ঘরের কোণে ব্যাঙ তো আছেই। আকাশে মেঘ হলেই কোণ থেকে কর্‌র্‌ শব্দ করে ডেকে ওঠে। রাত্রে পাশের ফ্যাক্টরির কোন অজ্ঞাত স্থান থেকে শেয়াল ডাকে নিত্য নিয়মিত।

আজ বিকেলে একটু সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে উঠেছিল আনন্দ। কমার্সিয়াল আর্টিস্ট আনন্দ কাল শনিবার করেছিল। রবিবার ও ঘুমোয়, আজ ভেবেছিল বেশি ক'রে ঘুমুবে। ঠিক করেছিল সন্ধ্যাতেও আর বের হবে না। কিন্তু তবুও ঘুম ভাঙল সকাল-সকাল। ঘুমের

মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে। কাল বিকেল বেলা মিশন রোয়ের একটা আপিসে গিয়েছিল, সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যু আর মিশন রোয়ের জংশনে তখন ট্রাফিক জাম হয়ে গেছে। সে আর প্রায় নড়ে না। সে যাচ্ছিল ট্যাক্সিতে। বড়বাজার থানার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা কপালীটোলার সঙ্গে মিশেছে, সেই রাস্তা ধরে বেরিয়ে এসেছিল একটি মেয়ে। ফিরিঙ্গি মেয়ে। হাঁটুর ওপরে ওঠা খাটো ফ্রক, মুখে ব্রণ, সে ব্রণগুলো রঙেও ঢাকা পড়েনি। বগলে ভ্যানিটি ব্যাগ, হাতে সিগারেট। বেশভূষায় রূপে অশ্লীলতাকে সযত্নে ফুটিয়ে তুলেছে এবং সেটা তার বড় বড় চোখ আর এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলের জন্যে অত্যন্ত খাপ খেয়েছিল। নিজে আর্টিস্ট আনন্দ, সে বলতে পারে—এ ছেড়ে অন্য যে কোন রকম মেকআপ হোক ওকে ওর থেকে ভালো মানাতো না। সে দামী ঝলমলে হলেও না। সুশীলা সাজে মনে মনে ওকে সাজিয়েও আনন্দ, দেখেছে কিন্তু তার থেকে করুণ ব্যাপার আর কিছু হ'তে পারে না—এটা সে নিশ্চয় করে বলতে পারে। সংসারে প্রত্যেক মানুষের একটা ক'রে স্টাইল আছে; এইটেই ওর স্টাইল। আনন্দ কপাল কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপনার মনেই, কতকটা স্থান কাল বিস্মৃত হয়েই, মৃদুস্বরে বলে উঠেছিল—হুঁ! মেয়েটা শুনতে পায়নি নিশ্চয়, কিন্তু ড্রাইভারটা পেয়েছিল। বুড়ো শিখ ড্রাইভার। সেও মেয়েটাকে দেখছিল, আনন্দের ছোট্ট 'হুঁ' শব্দটি শুনে তার দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীরভাবেই বলেছিল, চৌরঙ্গি যাতি হ্যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েটা সিগারেট টেনে উপর দিকে মুখ তুলে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়েছিল; সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোতে ঝড়ো হাওয়ার আমেজ লাগিয়ে ওই জাম ট্রাফিকের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে গাড়িগুলোকে পার হয়ে ওপারে উঠে আর একবার ধোঁয়া উড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। এবার ধোঁয়া ছেড়েছিল জাম ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর দিকে। ট্যাক্সি প্রাইভেট বাস লরীগুলো তারস্বরে হর্ন দিচ্ছিল; বোধ করি তাদের মুখেই ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে মেয়েটা ব্যঙ্গ করে গেল।

আনন্দ সকৌতুকে মৃদু শিষ দিয়ে উঠেছিল।

বুড়ো শিখও হেসে বলেছিল, বহুত্ মজেমে হ্যায়।

আনন্দ আর কথা বলবার সময় পায় নি। সামনে একখানা বাসে এবং একখানা প্রাইভেটে কাছ ঘেঁষে এসে গায়ে গায়ে লাগিয়ে এমন একটা তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক শব্দ তুলেছিল যে, চমকে উঠেছিল সে। প্রাইভেটখানার বাঁ দিকে মাডগার্ড চড় চড় শব্দে ছেড়ে গেল। মনটা চলে গেল ওইদিকে।

এরপর আর মনে হয়নি মেয়েটাকে। এরপর সে মিশন রোয়ে যে আপিসে কাজ ছিল সেখানে গেছে, তারপর সন্ধ্যাতে তাদের আড্ডায় গেছে। আড্ডা মানে একটা নিরিবিলি বার। সেখানে তাদের সমাজের—হ্যাঁ সমাজ ছাড়া আর কি বলতে পারে—আর্টিস্ট জার্নালিস্ট সাহিত্যিক সিনেমা পাবলিসিটির লোক এরা মোটামুটি এক গোষ্ঠী না হোক এক সমাজ, এদেরই কিছু লোক—এক্ষেত্রে এক গোষ্ঠী বলা যায়—তারা এসে জমে। আড্ডা মদ্যপান একসঙ্গে চলে। মদের গ্লাসের টুং-টাং শব্দের সঙ্গে রসিকতার প্রতিযোগিতায় তারই

মধ্যে মাঝে মাঝে প্রাণের কথা—সব নিয়ে চমৎকার জমে ওঠে। আবার ওই গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে ছোট ছোট দল—রাত্রির সঙ্গে দানা বাঁধে। তারপর দলগুলি খসে। এমনি এক দলে পড়ে কাল এরপর হৈ হৈ করেছে বারোটা পর্যন্ত। চুম্বক অবশ্যই ছিল। স্বজাতীয়া অর্থাৎ বাঙালিনীর নৃত্য—কোন এক গুপ্ত বারে। এর মধ্যে এই মেয়েটা যেন আসেই নি। একবার আধবার চকিতের জন্যে ওর দূরবর্তিনী সেই ট্রাফিকের দিকে ধোঁয়া ছাড়া ছবিটা যেন ধোঁয়া ছেড়েই পিছন ফিরে ভিড়ে মিশিয়ে গিয়েছিল। রাত্রে বাড়ি ফিরতে একটা হয়েছিল। এসেই শুয়ে পড়েছিল। চাকর জানে—শনিবার বাবু বাড়িতে খায় না, সে খেয়েদেয়ে শুয়েছিল—আনন্দ চাবী খুলে ঘরে ঢুকেছিল। ঘুম আসতে দেরি হয় নি। গাঢ় ঘুম ঘুমিয়েছে। রাত্রেও ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে নি। কিন্তু দুপুরবেলা স্বপ্ন দেখলে এবং সাড়ে তিনটে হতে হতে তার ঘুম ভাঙল। প্রথমেই মন বলেছিল—বেরিয়ে পড়। থানার পাশে রাস্তাটার মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকলেই দেখা মিলবে। কিন্তু শরীরটা কেমন যেন ভারী মনে হ'ল—যে মুহূর্তে তার মনে পড়ল যে, কাল যা পেয়েছিল সবই প্রায় শেষ করেছে কাল। বাড়িতেও টাকা নেই। আজ রবিবার ব্যাঙ্কও বন্ধ। শুধু ব্যাঙ্ক নয়—সব আপিসই বন্ধ। এসে সে দাঁড়িয়েছিল আটফুট বাই চার ফুট জানালাটার সামনে।

চৈত্রমাসের সাড়ে তিনটা। রোদ প্রসন্ন। তাত নেই। পার্কের গাছগুলোর উপর পড়েছে পশ্চিমদিক থেকে। পার্কটার চারিদিকে রাস্তা। ওপারের রাস্তায় ওয়ানওয়ে রুটে শহরের যত উত্তরমুখী গাড়িগুলো যায়। সারি সারি প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, বাস, লরী—ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে। কিছুটা দূরে পুলের মুখে যেমন যেমন ট্রাফিক ছাড়ছে—তেমনি এক এক ঝাঁক গাড়ি চলছে। চোখ তার সেইদিকে পড়ল। কিন্তু মন তার খুঁত খুঁত করছে। যাওয়া হবে না? মেয়েটা—। একবার গিয়ে আজও শুধু ওকে দেখে এলে কি হয়? কিন্তু—। নাঃ। পকেটে টাকা না থাকলে অস্বস্তি অনুভব করে আনন্দ। চাকরটার কাছে আর কত ধার পাওয়া যেতে পারে? এই তো সাতদিন আগে হরিয়া তাকে দিয়েই মনিঅর্ডার ফর্ম লিখিয়েছে। চল্লিশ টাকা বাড়ি পাঠিয়েছে। মাইনে পায় পঁয়ত্রিশ টাকা। বাড়তি পাঁচটাকা। বাজার খরচ, নিত্য খরচ থেকে কমিশন-টমিশন বাবদ আর কত পায় যে—এরপরও ওর হাতে বিশ-পঁচিশ টাকা হতে পারে?

থাক্ গে। আগামী কাল। আগামী কাল। আগামী কাল। সেই টুমরো টুমরো অ্যাণ্ড টুমরো। এপারে তার বাসাটার ধারের রাস্তাটা নির্জন। বাড়িও কম। এপথে গাড়ি নেই। এখন সাড়ে তিনটেতে লোকজনও নেই। চৈত্রমাসে দেবদারু গাছগুলোর সব নতুন পাতা। কাঁচা সবুজ। বাতাসে দুলছে আর রোদের ছটায় পাতার কাঁচা রঙের পালিশ থেকে কাঁপানো ছটা বাজিয়ে ঝিকিকের একটা ঝিলিমিলি—ঝিকিমিকি তুলছে। কয়েকটা শিমুল জাতীয় গাছের পাতা ঝরে গেছে নিঃশেষে। শুকিয়ে যাওয়া মতো ডালগুলোয় বড় বড় লাল ফুল ফুটেছে। ক'টা কাক পথে নেমেছে, রাস্তার উপর থেকে কিছু খুঁটে খাচ্ছে। ও—। বেলা দশটা নাগাদ ফুটো ময়লা ফেলা গাড়িটা গেছে রাস্তার উপর দিয়ে ময়লার ছড়া ছড়িয়ে। ক'টা চড়ুই পার্কের ধারে রাস্তার পাশে ধুলোস্নান করছে।

কলকল কচকচ করে ঝটপট করে মারামারি করতে করতে চার-পাঁচটা শালিক উড়ে যাচ্ছে। দুটোর জড়াজড়ি করে ধপ করে মাটিতে পড়ল। চড়ুইগুলো আশেপাশে কোথায় অজস্র ক্রিচ-ক্রিচ ক্রি-র্‌ র্‌-র্‌ ক্রি-র্‌-র্‌ র্‌ করছেই করছে। চীনে চড়ুই নির্বংশ করেছে। এখানে করে না? মার্ক্সিস্ট সে নয়। কম্যুনিস্টদের প্রেমেও সে পড়ে নি, কিন্তু চীনের এইটেই তার ভাল লাগে।

কম্যুনিস্ট সে নয়, কোন বাদ বা বাদানুবাদের ধার সে ধারে না। এখানকার কম্যুনিজমকে সে বাদ বলে না—বলে অনুবাদ। সেই হিসেবে সে বলে—ওসব বাদানুবাদে আমি নেই। তবে চীন রাশিয়াকে তারিফ করি—তার কারণ তারা ঈশ্বর নামক কল্পনাটিকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। জীবনের সমস্ত পথে বাধা এই কল্পনার প্রস্তরখণ্ড! আর চীনকে তারিফ করি চড়ুই আর মাছি নির্মূল করেছে বলে।

অকস্মাৎ একটা কাক একটা বড় দেবদারু গাছে মাথা থেকে ছোঁ মারলে। এঁকে বেঁকে আশ্চর্য গতিতে ছোঁ মারা ওদের। একটা চড়ুই—! সেটাও আশ্চর্য গতিতে ছোট দেবদারু গাছটার পত্রপল্লবের ভিতরে জলের মধ্যে মাছের মতো পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কাকটা গতিবেগ সামলাতে এসে ইলেকট্রিক তারের উপর বসল।

পার্কটার ভিতরে কর্পোরেশনের ছোট অফিসটার ওখানে একদল ঝাড়ুদার জমেছে। গোলমাল করছে। ওধারে বাস চলা ওয়ানওয়ে রাস্তাটায় একটা বাস লম্বা একটা কাঁ-চ শব্দ তুলে ব্রেক কষে দাঁড়াল। পিছনে সারিবন্দী গাড়ি।

শিমুল জাতীয় পত্রহীন ফুল-কোটা গাছটায় কয়েকটা ছেলেমেয়ে ঢেলা ছুঁড়ছে, ফুল পাড়বে। বাচ্চা ছেলেমেয়ে। আজ রবিবার বিকেলে পার্কে বেশ ভিড় হয়। পার্কটার একদিকে খানিকটা মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট। হরেক রকম সাজে সেজেগুজে মেয়েরা আসবে। কত রকম কাপড়পরা সত্তর বছরের বৃদ্ধা থেকে প্রৌঢ়া যুবতী কিশোরী বালিকা। নানারকম পোশাক—নানান খোঁপা—চুল বাঁধা—নানান চেহারা। এক প্রৌঢ়া আসেন—তিনি নিত্যই আসেন—কারণ যেদিনই আনন্দ বিকেলে বাসায় থাকে সেইদিনই সে তাঁকে দেখে—নাতি-টাতি জাতীয় একটি শিশুকে কোলে নিয়ে পার্কে ঢুকছেন। তার সাজসজ্জা, কেশ-পারিপাট্য দেখে সে চমৎকৃত হয়। মুখে পাউডারের পাক না থাক স্নো-ঘষা হাত যে মুখে বুলোন তাতে সন্দেহ নেই। এককালে সুন্দরী ছিলেন। ও দেখে আনন্দ স্পষ্ট বুঝতে পারে—মহিলাটি মনে মনে আজও যৌবনব ন বিচরণ করেন। কৌতুক অনুভব করে সে।

সেদিন বারের আড্ডায় এক অনতিক্রান্তযৌবনা সমাজ-রাণী জাতীয় একটি মেয়েকে দেখে তার এক বন্ধু বলেছিল—চেন ওকে? ওই যে—রূপালী চুলনী সিগারেট পাইপ হস্তা? উনি স্বনামধন্যা—।

আনন্দ বিস্মিত হয়েছিল বিখ্যাত মহিলাটির নাম শুনে। অবশ্য তিনি বারে বসেন নি, তিনি একটা সেলুন থেকে বেরিয়েছিলেন। আনন্দ সেই কথার সূত্র ধরে মহিলাটির কথা বলেছিল।

বন্ধু বলেছিল—তুই বীটনিক না অ্যাংরি ইয়ংমেন রে?

—কেন?

—যে ভাবে দুনিয়াকে দেখছিস, বিচার করছিস—তাই বলছি।

সে বলেছিল—যা বল। তবে আমি নিজে দুটোর একটাও নই। আমি আনন্দ রায়। আমি ইস্কাপনকে ইস্কাপনই বলি। সে বিবি হলেও খাতির ক'রে মুখের চারিপাশে শেড দিই নে। কিংবা মুখে ইণ্ডিয়ান রেড লাগাই নে। আইভরি ব্ল্যাক ব্যবহার করি। সেক্স সত্য, মানুষ যত সত্য তত সত্য। এটা আমি জানি এবং মানি, কারণ আমি একজন মডার্ন মনুষ্য। এবং আমি নারীজাতিকে ভয়ও করিনে বা তার পশ্চাতেও উন্মত্তবৎ ছুটিনে। সংসারে নারীজাতির মধ্যে একটি নারী আছেন যিনি আমার মা। ভগ্নী সেই বাকী নারী জাতিকে ভাগ করি বৃদ্ধা প্রৌঢ়া যুবতীর মধ্যে। তাঁরা সবাই নারী। তাঁদের দেখি রূপ, দেখি ব্যবহার, বিচার করি। যিনি লভ্যা তাঁকে রুচিতে না বাধলে লাভ করতে চাই। কিন্তু প্রেম ক'রে নয়—বিনিময়ে। তবে কেউ যদি সাময়িক প্রেম বিশ্বাস করতে পারেন তার সঙ্গে সাময়িক প্রেমেও আমার বাধা নেই।

বন্ধু বলেছিল—বাপ্‌স্। তুই তো লীডার রে বাবা—

—নো। সহস্রের মধ্যে বলব না—তবে আমি শতজনের একজন। তুমিও তাই। ও-ও তাই।

—গুড। উই আর অল বার্ডস অফ দি সেম ফেদার।

সে বলেছিল—উই আর অল ক্রোজ। কাক পক্ষী। কারণ কাকই সব থেকে বেশি এবং সাধারণ। এবং কাকদের কোন বিষয়ে কোন প্রেজুডিস্ নেই। এবং দারুণ ঐক্য তাদের মধ্যে। শালিকও কমন—কিন্তু শালিক আমরা নই, কারণ তারা বড্ড বেশি কলহ মারামারি করে—যা আমরা করিনে।

কাক-চরিত্র সে ছেলেবেলা থেকেই জানে। কিন্তু এখানে এসে অবধি এই পার্কটার জন্ম এবং এখানকার খোলা ড্রেনের জন্ম কাকেদের আধিক্য হেতু কাক-চরিত্র আরও ভাল ক'রে অধ্যয়ন করতে পেরেছে।

থাক। আজ কাক চরিত্র আর নারীচিত্র দেখেই বিকেলটা কাটুক। না। দেবদারু কচি পাতায় পড়ন্ত সূর্যের আলোর খেলাটা হঠাৎ যেন মনোহারিণী হয়ে উঠল। বাঃ। পশ্চিম আকাশে মেঘ ছায়া ফেলেছে। তাইতে শেড পড়েছে। প্রদীপ্তবর্ণা আলো এই ছায়ার উজ্জ্বল শ্যামাশ্রী হয়ে উঠেছে।

খিল খিল হাসির শব্দে নির্জন পথটা চমকে জেগে উঠল। নারীকণ্ঠ।

আলোর রূপ আছে—কিন্তু কায়া নেই; কায়ার আকর্ষণ আছে। সে চোখ ফেরালে। হুঁ। আরম্ভ হল নারী অভিযান। একদল মেয়ে—সম্ভবতঃ একই বাড়ির—আসছে। সে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত। সপ্তরথিনী না সপ্তসমুদ্র। না, সমুদ্র নারী নয়। চারটি যুবতী—তার মধ্যে একটি বিবাহিতা। মাথায় ডোনাল্ড খোঁপা। তিনজন বিশ থেকে ষোলর মধ্যে ডবল বেণী সিংগ্‌ল বেণী এলো খোঁপা বাধা। তিনটির দুটি বালিকা—একটি বছর তিনেকের। ওদের বয়ছাটা চুল।

—বাবু! চা করব?—হরিয়া চাকর।

—নিশ্চয়!

—রাত্রে?

—বাড়িতে খাব। নিরিমিষ। বুঝলি!

—হুঁ।

ছাতা—লেডিজ ছাতা আসছে! এ দল পার হয়ে গেল প্রায়। কিন্তু আনন্দের সব ঔৎসুক্য ধাবিত হল ছাতার দিকে। ছাতার দিকে নয়, ছত্রধারিণীর দিকে।

দীর্ঘাঙ্গী সুকৃষ্ণা। মানে সুন্দর কৃষ্ণা। আনন্দ রায় এই পাড়ায় নতুন এসেছে। মাসখানেক। মেয়েটি ঘড়ির কাঁটার মতো সকালে একবার বিকেলে একবার এমনই ছাতায় নিজের মুখ ঢেকে চলে যায়। পার্কের যাত্রিণী ও নয়। মুখ ঠিক দেখে নি তবে দেখেছে ওর কালো রঙ আর কালো চুল। একরাশি কালো চুল, এবং সে কেশরাশি ওর দীর্ঘাঙ্গীত্বের সঙ্গে সমতা রেখে দীর্ঘ। হয়তো একটু বেশি। কোমর ছাড়িয়েও নিচে নেমে থাকে। এই বিশেষ সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মেয়েটি সচেতন—শ্যাম্পু ক'রে খুলেই রাখে। ক্বচিৎ দেখা যায় মুক্তকেশী কৃষ্ণার পটভূমি কৃষ্ণ মেঘমালা আজ দুলছে না, ফুলছে না। আর একটি বিশেষত্ব ওর হাঁটার ভঙ্গি। দীর্ঘাঙ্গীদের পায়ের দিকটাই দীর্ঘতর হয়, সুতরাং পদক্ষেপ স্বাভাবিক-ভাবে হওয়া উচিত দীর্ঘ। কৃষ্ণা কিন্তু দীর্ঘ পায়ে খাটো খাটো করে খুব দ্রুত ছন্দে চলে। তাতে একটি নৃত্যভঙ্গির সৃষ্টি হয়। মেয়েটির নাচ জানা উচিত।

ময়না পাড়ার মাঠে মেঘ এলে কালো মেয়ের মতো আকাশের দিকে চেয়ে বারেক তার দিকে তাকিয়ে গাইটিকে ডাকবার জায়গাও এ নয়, কথাও ওর অবশ্যই নয়—কিন্তু কোনদিনই কোন কারণে ছাতাটিকে সোজার বদলে ঘাড়ে ফেলে আকাশে দিকেও তাকালে না, কোন ভাই বোনকেও ডাকলে তার দিকেও তাকালে না। ওর চোখ কালো হরিণ চোখ কি না সে দেখা আনন্দর আর হল না। মধ্যে মধ্যে মনে হয় দেখলে ছবি এঁকে কোন কালিওয়ালা কোম্পানিকে বেচে আসতে পারত। ক্যাপসন দিত—'যতই কালো হোক্'! উঁহু। ক্যাপসন দিত—'চিকন ছাঁদে লেখা আমার এমনই কালো হোক্'।

অবশ্য ঔৎসুক্য থাকলেও মনোযোগ আকর্ষণের কোন চেষ্টাই কোনদিন করেনি আনন্দ। ওর নিজেরও যে সে মাঠ চাই। আনন্দর সে মাঠ চৌরিঙ্গীপাড়া। আজ কিন্তু ইচ্ছে হ'ল সজোরে 'হরিয়া' বলে চীৎকার ক'রে ওঠে। না, থাক। ছত্রধারিণী চলে এসেছে তার জানালার সামনে। হাতের কনুই আর সঞ্চরমাণ পায়ের পাতা দুখানির অগ্রভাগ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। সাদা কাপড়। একহাতে ছাতা, অন্য হাতে খাতা বা বই। কাজেই কনুই ছাড়া গোটা হাত দুখানাও দেখা যায় না। ব্লাউজটা উজ্জ্বল জরদা রঙের।

আরে! কি হল? একটা কাক ছোঁ মেরে নেমে এসেছে ওর ছাতার উপরে! কি কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে ঘটল ঘটনাটি—একটা পিনকুশনের মতো কিছু এসে সজোরে লাগল আনন্দর ডান ভুরু চোখ এবং নাক ও ভুরুর সংযোগস্থলে। কটা পিনের ডগা যেন বিঁধে গেল। নিষ্ঠুরভাবে বিঁধে গেল। মুহূর্তে ডান হাতখানা আপনা-আপনি উঠে বস্তুটাকে

চেপে ধরলে এবং মুখ থেকে যন্ত্রণাকাতর এবং ক্ষুব্ধ চীৎকার বেরিয়ে গেল—অঃ। এবং টেনে ছাড়িয়ে নিল বস্তুটাকে। বিঁধে যেন আটকে গিয়েছিল। নরম। উষ্ণ। হাতের মুঠোর মধ্যে সে স্পন্দন অনুভব করছে! হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে কম্পন।—কি?

কি? একটা চড়ুই পাখী। আনন্দের দৃষ্টি যখন ছত্রধারিণীর ছত্রের কালো কাপড় থেকে মাটির দিকে ওর চুল, ওর জরদা রঙের ব্লাউজের হাতা, কনুই, ধবধবে পাড়হীন কাপড়ের বেড় বেয়ে স্যাণ্ডেল পরা পায়ের পাতার দিকে বিচরণ করছিল, তখন কাক শালিক চড়ুই প্রভৃতি পক্ষীরাজ্যের নিয়মানুযায়ী তাদের জীবনযাত্রা চলেছিল স্বাভাবিক ভাবে। ইলেকট্রিক পোস্টে বসে থাকা একটা কাক একটা উড়ন্ত চড়ুইকে লক্ষ্য ক'রে ছোঁ মেরে নেমে এসেছিল,—চড়ুইটা প্রাণভয়ে উন্মাদের মতো সম্মুখে ওই জানালাটার দিকে উড়ছিল, কারণ আর কোন আশ্রয় সামনে ছিল না। ওদিকে কাকটা ছোঁ মেরে এসে ঝোঁক সামলাতে না পেরে ছত্রধারিণীর ছত্রপান্তে পাখার ঝাপট মেরে উপরে উঠে গিয়েছিল—এদিকে চড়ুইটা উন্মাদ পলায়নের বেগে এসে শিকের ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকে—আনন্দর চোখের উপর ও নাক-ভ্রূর সন্ধিস্থলে ঝপ ক'রে পড়ে নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল।

আনন্দ নিষ্ঠুরভাবে টিপে ধরলে চড়ুইটাকে। টিপেই মেরে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে টপ টপ করে দু-ফোঁটা রক্ত ঝরে এসে পড়ল তার পাঞ্জাবির উপর। ঘরের ভিতরে দেওয়ালে টাঙানো আয়নায় তার ছবি পড়েছে। চোখের কোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে আসছে। মুখখানা রূঢ় কঠোর নির্মম হয়ে উঠেছে। দাঁতের উপর দাঁত শক্ত হয়ে বসেছে। হাতের মুঠোও শক্ত হচ্ছে।

—ইস্, এ যে চোখ থেকে রক্ত পড়ছে আপনার! মিষ্ট উদ্বিগ্ন নারী-কণ্ঠস্বর। ওই ছত্রধারিণী কৃষ্ণার। আনন্দ ফিরে তাকালে। হেসে বললে—হ্যাঁ। একটা চড়ুই।

হাতের মুঠোটা খুলে দেখালে সে। তালুর উপর চড়ুইটা হতচেতন হয়ে পড়ে আছে। পা দুটো মুড়ে বেঁকে গেছে। চোখ দুটো স্তিমিত। মধ্যে মধ্যে শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আবার আনন্দ মেয়েটির মুখের দিকে তাকালে। বেশ মুখ। লম্বা ধরনের মুখ। টিকলো নাক। চোখ দুটো আয়ত নয় কিন্তু না লম্বা। পাতলা ঠোঁট। মসৃণ মুখ। নিরীহ, শান্ত। সে তার কথার পুনরুক্তি ক'রে প্রশ্ন করলে—চড়ুই!

—হ্যাঁ চড়ুই। একটা কাক ছোঁ মেরেছিল—সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আপনার ছাতায়—

—হ্যাঁ। চমকে উঠেছিলাম আমি। ছাতাটা একপাশে বেঁকিয়ে দেখলাম কাকটা উড়ে যাচ্ছে—আর আপনি চোখে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন। তারপরই দেখি রক্ত পড়ছে আপনার চোখ থেকে।

—চড়ুইটা প্রাণের ভয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে সামলাতে পারে নি—পাশ কাটাতে পারেনি বোধ হয় শিকগুলোর জন্যে। ঝপ করে এসে পড়েছে চোখের উপর।

সে আবার তাকালে—চড়ুইটার দিকে। এবার চোখ মেলেছে—তাকাচ্ছে। কালো চকচকে দুটি চোখ। দু ফোঁটা টলটলে কালির ফোঁটার মতো। আশ্চর্য ভাবে মনটা তার করুণায় কোমলতায় ভরে উঠেছে। রূঢ়ভাবে সেটাকে টিপে ধরার জন্য যেন মনে একটু লজ্জা হচ্ছে। বেদনাও অনুভব করছে। আহা বেচারা প্রাণের ভয়ে তপ্ত খোলা থেকে

লাফিয়ে আগুনে পড়ার মতো তার মুখের উপর এসে পড়েছে মাথা ঠুকে। এবার নড়ছে।

মেয়েটি জানালার ওপাশ থেকে বললে—আপনি রক্তটা ধুয়ে ফেলুন। না—বরং ডাক্তারকে দেখান। চোখের ভিতরে কিছু—

—চোখের ভিতরে?—সে আয়নাটার দিকে তাকালে। ঠিক কোণ থেকেই রক্ত গড়াচ্ছে, কিন্তু চোখের ভিতরে নয়। শুধু জ্বালা করছে, বিন্দু বিন্দু করে রক্তও জমে জমে গড়াচ্ছে—কিন্তু কোন বেদনা নেই। কিন্তু—কিন্তু—। আয়নার মধ্যে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে অবাক হয়ে গেল সে। এই মিনিট খানেক আগে, রক্তের প্রথম ফোঁটাটা জামায় পড়তেই চড়ুইটাকে হাতের মুঠোয় টিপে ধরে তখন কি হয়েছে দেখবার জন্য আয়নার দিকে তাকিয়েছিল—তখনকার ছবিটা তার মনে পড়ে গেল। রূঢ় হিংস্র নিষ্ঠুর একজনকে দেখেছিল সে। তার বদলে এ কে? শান্ত কোমল প্রসন্ন একটি মানুষ।

বাইরে থেকে মেয়েটি প্রশ্ন করলে—চোখে ক্ষত হয়েছে?

একটু হেসে সে বললে—না। তার মুখের দিকে সে আবার তাকালে। কালো লম্বা মেয়েটি—একটু শীর্ণা, লম্বাটে মুখ সরু কিন্তু টানা চোখ। ওই চোখের লম্বা টান এবং ওই একরাশ দীর্ঘ চুল ছাড়া শ্রী কোথাও নেই। তবু বেশ লাগল তাকে।

মেয়েটি বলেই যাচ্ছিল—তা হোক। চোখের ভিতর কিছু হয় নি—সে আপনার লাক্। কিন্তু পাখীর নখ—বিষ থাকে শুনেছি। তা ছাড়া পাখী তো ডালে পাতায় পথে ধুলোয় নোংরায় অহরহ ঘুরছে বসছে, বিষ লেগে নিশ্চয় থাকে। ওটা আপনি ধুয়ে ফেলুন। মানে আইডিন-টাইডিন দিয়ে। ডাক্তার দেখালেই ভালো করবেন।

আনন্দ বললে—ধন্যবাদ। হ্যাঁ তাই দেখাব।

বলে সে পাখীটার দিকে তাকালে। সেটা এখনও ধাক্কা সামলাতে পারে নি। উঠবার—পাখা ঝেড়ে উড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

মরে যাবে নাকি? ভারী কষ্ট লাগল। সে বললে—এটাকে একটু জল দি!

—আপনি আর্টিস্ট—না? হেসে বললে মেয়েটি। তারপর বললে—ওটাকে বরং কোন তাকে তুলে দিন—সামলে উঠবে। জল দেবেন—হয়তো নাকে ঠোঁটে বেশি জল পড়লে দম বন্ধ হবে নয় বুকে আটকাবে। আচ্ছা—নমস্কার।

চলে গেল সে। খাটো পাদক্ষেপে। লম্বা পা দুখানি থর থর ফেলে সে ছাতাটিতে নিজের মুখখানা যথাসম্ভব ঢেকে চলে গেল।

হরিয়া চা নিয়ে এল। তাকে বললে—টিংচার আইডিন আছে রে?

হরিয়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললে—কি হইল?

—কিছু হইল। কেটে গেল। একটু জল আর টিংচার আইডিন আন তো। চায়ের কাপটা সে হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললে—বাঃ, বেড়ে চা করেছিস তো।

বাইরে আলো যেন লালচে হচ্ছে। আকাশের মেঘে সূর্যের পড়ন্ত আলোয় রক্তসন্ধ্যার ছটা ফুটছে। মেয়েটি বেশ! বাইরে মেয়ের দল আসছে—এদিক ওদিক দুদিক থেকে। আনন্দ একমনে কিছু ভাবতে লাগল। রক্তসন্ধ্যার পটভূমিতে কালো দীর্ঘাঙ্গী এলোকেশী,

লম্বা টানা সরু চোখ।

* * * *

পরের দিন তখন বেশ একটু বেলা হয়েছে। আনন্দ উঠল। একটু যেন জ্বর জ্বর যন্ত্রণা সারা মুখে যন্ত্রণার কেন্দ্রবিন্দু চোখের কোণ, ভুরু ও নাকের সংযোগস্থল। হাত দিয়ে দেখল। ফুলেছে নাকি? একটু। আয়নার দিকে তাকালে। হ্যাঁ, একটু ফুলেছে। রাত্রে বুঝতে পারে নি। রাত্রে খুব গাঢ় ঘুমিয়েছে টিংচার আইডিন লাগিয়ে কিছুক্ষণ জানালার ধারে সেই পূর্বের মতোই দাঁড়িয়েছিল। মনটা খুব প্রসন্ন, তার থেকেও বেশি উল্লসিত, খুব খুশি হয়ে গেছে। বাইরের দিকে খুশি হয়ে তাকিয়েছিল কিন্তু কিছুই দেখে নি—মানে ঠিক দেখে নি—কারুর দিকে মন আকৃষ্ট হয় নি। সেই প্রৌঢ়া পক্ককেশা বিলাসিনী গেলেন, কোলে নাকি হাতে পান—মনে সে কোন কৌতুক অনুভব করে নি। একদল ছোট মেয়ে আছে, তাদের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে, তারা এসে চলে গেছে। কি যেন বলেও ছিল—সে বলেছিল—হুঁ। কিসের উত্তরে হুঁ বলেছিল মনে নেই। রক্তসন্ধ্যা গাঢ় হয়েছিল, কাঁচ পাতার ঝিকমিকিতে লাল আভা একটু মেরেছিল বোধ হয়, সেদিকেও ভালো করে তাকায় নি। ভাবছিল—বেড়ে রোমান্সটুকু হয়ে গেল। এরপর? বিয়ে? রাম কহো! ও পথে আনন্দ হাঁটে নি—হাঁটবে না। একটু খেলা? তা মন্দ হয় না। মন অনেক দূর ছোটে। সে এ পাড়ার থেকে হয় না। তবে? অন্য পাড়ায় উঠে গিয়ে তবে হয়। যা দেশ!

সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!

আনন্দের থিয়েটারে ঝোঁক আছে। সে অবশ্য সিরিও-কমিক পার্ট করে। সিরিয়াস পার্ট করতে পারে না। হাসি পায়। অবশ্য তার একারই নয়—এ যুগের সব তরুণেরই তাই! তরুণ তরুণী—সব। তবুও চন্দ্রগুপ্ত নাটকের 'কি বিচিত্র দেশ' ভাল লেগেছিল ছেলেবেলায়। সেটা আজও লাগে। সোজা বাঁকা সব কথাতেই দেশের কথা উঠলে এই কোটেশন দেয় সে।

এ দেশে একটি মেয়ে একটি ছেলে পরস্পরে হাস্যে লাস্যে রসিকতায় সঙ্গ সাহচর্যে কয়েক দিনের জন্যে মিলবে খেলবে, আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে ভুলবে—এ হবার উপায় নেই। কাল তবুও মন বাঁধ মানে নি। রোমান্সহীন দেশ, বিয়ের আগে বর ক'নেতে আগে দেখা হত না। সাত পাকের সময়ে আজও পানে মুখ ঢেকে ক'নে শুভদৃষ্টি করতে আসে। বিংশ শতাব্দীর এটা ষাট বছর পার হল, গোটা দেশে আজও ঘুঁটেতে উনোন ধরে। দামোদর প্রজেক্ট—ইলেকট্রিসিটির প্রসার করতে গিয়ে দেখা গেল, দামোদরের জল কমে গেছে। এ দেশে এখনও রোমান্স পত্রযোগে—বড়জোর আপিসে সহকর্মী-সহকর্মিণীর মধ্যে—তাও আপিসের পরে ধর্মতলার কার্জন পার্কে কাগজ পেতে মাঠে বসে গোটাকয়েক আধা আধো কথা বিনিময়, একটু যাকে বলে—অনুচ্চ খাটো হাসিতে তাও সম্পূর্ণ হয়ে ফুলস্টপ পর্যন্ত এগোয় না, অন্য কেউ তাকালেই সেই তাকানোর কথা সেমিকোলনেই শেষ। সুতরাং আজকের এই চড়ুইয়ের নখে দু ফোঁটা নাকের কোণের রক্তপাত দেখে একটি তরুণী মেয়ের অকৃত্রিম সহানুভূতিতে

এগিয়ে আসা কি সোজা রোমান্স! আনন্দর মন আপনিই ছুটেছিল—স্বাভাবিক ভাবেই। মনে মনে কাল বিকেলে ওকে নিয়ে ময়দানে বেড়িয়েছে, হাতে হাত রেখে পাশাপাশি বসেছে। রাত্রে—জেটীর উপর রেস্টুরেন্টে বসেছে।

মনটা তার অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এমন দিনে তার কাছে টাকা নেই! কখন আপনার অজ্ঞাতসারেই ডেকে ফেলেছিল—হরিয়া।

হরিয়া সাড়া দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে,—যাই। এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই এসে, সামনে দাঁড়িয়েছিল।—কি?

—ও! হ্যাঁ। মানে, তোর কাছে টাকাকড়ি আছে? কুড়িটে টাকা—

—অতো নাই। দশ টাকা আছে।

—দশ টাকা?—আচ্ছা তাই দে। না—চলে যা বাজারে। বিলিতী মদের দোকান বের করে নিবি খুঁজে, বুঝলি? একটা রম হুইস্কী পাইট নিয়ে আসবি। বুঝলি? আর ভাল ক'রে মাংস বানাবি।

হরিয়া চলে গিয়েছিল। সে এবার গতি পেয়েছিল দেহে মনে। সর্বাগ্রে দেখতে গিয়েছিল চড়ুইটাকে। কই? চড়ুইটা কোথায় গেল? কই, উড়ে তো জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায় নি। ঘরখানা অপরাহ্নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হচ্ছে ক্রমশ। এরই মধ্যে আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। জানালার সামনেটায় খানিকটা মেঝেতে খানিকটা আলো যেন এলিয়ে শুয়ে পড়েছে মাটির উপর। উপর দিকটা চারিপাশ বেশ কালো দেখাচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে সুইচটা টিপে আলো জ্বালালে। কোথায় গেলেন তিনি?

সঙ্গে সঙ্গে—চি-রি-ক—শব্দ করে চড়ুইটা উড়ল, ওই আলোটারই বাঁকা হোল্ডারটার উপর থেকে। ওই যে! তাক থেকে উড়ে গিয়ে কখন আলোটার উপর বসেছিল। আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠতেই চমকে উঠে উড়ছে। ভয় পেয়েছে। বেচারা!

সারা ঘরখানায় উড়ে পাক দিয়ে গিয়ে বসল একবারে ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ইলেকট্রিক লাইনের বিটের উপর। কাঁপছে। নখ দিয়ে বিটের কাঠ আঁকড়ে ধরে দেয়ালের কোণে যেন লেগে আছে। একটু সকরুণ হেসে আবার সে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিল। থাক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিয়া ফিরে এসেছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোতল খুলে খানিকটা খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে খুশি হয়ে উঠেছিল। নেশা ধরতে দেরি হয় নি। হরিয়ার তুলনা হয় না। অদ্ভুত স্প্লেনডিড্, ওয়াণ্ডারফুল। মুখরোচক খাদ্যগুলি তৈরি করে ডিসে পরিপাটি করে সাজিয়ে দিয়েছিল।

গান সে গাইতে পারে না। তবুও মৌজের মুখে—বেশ গলা ছেড়েই গান ধরেছিল—

'কালো তা সে যতই কালো হোক—
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ!'

কিছুক্ষণ পর মনে পড়েছিল—কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে। কালো কেশে রাঙা কুসুম—। নাঃ—তারাশঙ্কর এখানে ফেল। হয় নি।

প্রমত্ত আনন্দের এলোমেলো চিন্তাগুলো চঞ্চল চড়ুই পাখীর মতোই মনের গাছের মধ্যে

লাফিয়ে লাফিয়ে এ-ডাল ও-ডাল করেই যেন ফিরছিল। বাইরে একটা বরফওয়ালা হাঁকছিল—ব্রোফ! তাকে ব্যঙ্গ না করেই সে তার নকল করেছিল—ব্রোফ! তারপরই সে নকল করেছিল চড়ুইয়ের ডাক—ত্রি-রি চ! হয়তো বা দুটো শব্দের রফলায় একটার সঙ্গে অন্যটার কোথাও মিল পেয়েছিল।

হঠাৎ মনে প্রশ্ন হয়েছিল—চড়ুইটা কি?

নারী অথবা—? কি? সে চেনে, চড়ুইয়ের কোনটা পুরুষ কোনটা মেয়ে। পুরুষ চড়ুইগুলো লালচে হয়, গলার নিচে একটা কালো রংয়ের ত্রিভুজ দাগ থাকে. বেশ ঘন কালো। মেয়েগুলো ধূসর হয়, মানে একটু ফর্সা, গলায় কালো দাগের হারের মতো একটা বেড় থাকে। ডাকেরও পার্থক্য আছে। এটা কি? নারী? নিশ্চয়। না—ভালো করে দেখে নি তখন। আছে নাকি এখনও? বেরিয়ে গেল কখন? সে উঠে খুঁজতে শুরু করেছিল। কই? কোণটা দেখেছিল সর্বাগ্রে। তারপর আলোর হোল্ডারটা। তারপর এদিক ওদিক। কই? পায় নি দেখতে।

পালিয়ে গেল?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল—'ওরে রাজহংস জন্মি দ্বিজবংশে এমন নিষ্ঠুর কেন হলি রে'?—ভুল হ'ল নাকি? হোক্। সে ছবি আঁকে—লাইনে ভুল না হলেই হল। রাজহংসের ছবিতে—। থমকে গিয়েছিল আনন্দ! ই-য়ে-স! হয়েছে! ইউরেকা! ইউরেকা!

—হ-রি-য়া! হরিয়া।

হরিয়ার পেটেন্ট উত্তর—যাই। এবং মুহূর্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল।—কি?

—রঙ তুলি দে! ছবি আঁকা কাগজ—

—ছবি আঁকবে—এখন?

—এখুনিই।

ছবি আঁকবে সে। চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে। না—চটকদূত ও কৃষ্ণা। একটা জানালা—তার শিকে বসে আছে চটকদূত, বা পাখা মেলে এসে সদ্য বসছে। কালো—না কৃষ্ণা পথে থমকে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়েছে; একটা পা এইদিকে বাড়িয়ে দেবে। ইউরেকা!

হরিয়া বলে উঠল পিছনে রঙ তুলি কাগজ-রাখা দেওয়াল আলমারীর কাছ থেকে—চড়ুই পাখীটা!

—চড়ুই পাখী?

—হঁ। সেই বিকেল বেলার পাখীটা হবে।

—কোথায়?

—এই যে, আলমারীর তাকে রঙের বাস্‌কোটার উপর বসি রইছে।

—বসি রইছে?—আনন্দ অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠে পড়ল। বললে—ওড়াস নি। থাক।

—রঙের বাস্‌কোটার উপরে বসি রইছে যে!

—থাক। রঙের বাকসো নাড়িস নে। থাক ছবি আঁকা। সরে আয় তুই।

হরিয়া সরে এল। আনন্দ এগুলো না বেশি, দূর থেকে দেখলে।—ধূসর রঙ, গলায় কালো

একটি বেড় শুধু কালো হারের মতো। ত্রিভুজ নয়।—দূতী! দূতী!

দূত হলে আজ ওটাকে ওই বোতলের পানীয়ের সঙ্গে রোস্ট করে খেয়ে নিত আনন্দ।

কিন্তু দূতী—সখী তুমি থাক। তুমি থাক।

—হরিয়া।

—অঁ।

—পাঁউরুটি আছে?

—আছে।

—খানিকটা ভেঙে গুঁড়ো ক'রে ছড়িয়ে দে। সেই বিকেল বেলা বেরো থেকে ঘরে ঢুকেছে, বেরোয় নি তো, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। আর রাত্রে একটা ছোট বাটিতে জল দে একটু। এঁ্যা?

হেসে হরিয়া বললে—রাত্তিরে উরা কানা হয়ে যায়। খাবে না।

—তুই দে তো। আলো থাকলে কানা হবে কেন? রাত্রি কোথাকার।

মুচকি হাসতে হাসতে হরিয়া চলে গেল। হরিয়া মনিবকে জানে। দিনের মনিব রাত্রিকালের মনিব আলাদা। সে দুজনকেই চেনে।

আনন্দ দূর থেকেই সস্নেহ মমতার দৃষ্টিতে চড়ুইটার দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট্ট জীবটি। এতটুকু! ওঃ, ওই কৃষ্ণা যদি সেই শঙ্কিত সহানুভূতি মাখানো কণ্ঠে, তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে—ইস্, আপনার চোখ থেকে রক্ত পড়ছে যে!—কথা কটি না বলত তাহলে মুঠোয় টিপে ধ'রে মেরে ফেলত সে। মনে পড়ছে, মাটিতে সজোরে আছড়ে ফেলে দেবার হিংস্র অভিপ্রায় গর্তের মধ্য থেকে ক্রুদ্ধ সাপের বের হবার মতো পাক দিয়ে উঠেছিল। হঠাৎ ওই কথা কটি এবং বলার সুরটি, তার সঙ্গে নারী-কণ্ঠটি বাঁশের বাঁশীর মতো বেজে উঠে সাপটাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল।

সে মৃদুস্বরে পাখীটাকে বলেছিল—Ask your God to bless her—not me. She is—কালো? তা সে যতই কালো হোক—আমি দেখেছি তার কালো-হরিণ চোখ।

হরিয়া ফিরে এসেছিল পাঁউরুটি গুঁড়ো এবং জল নিয়ে।

—দুধ তো আমাদের নেই। চায়ের জন্যে—সেও তো পাউডার মিল্ক। তাই একটু ক'রে দে না। না। থাক। ওই থাক এখন।

—খাবে না। রাত্তিরি যে—। হাসলে হরিয়া।

—তুই এত ফ্যাক্ ফ্যাক্ ক'রে হাসিস কেন বল্ তো?

হরিয়া বলেছিল—খাবার হয়ে গেছে। রাত্তিরি ইগারোটা বেজে গেল।

বোতলটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল আনন্দ। সব শেষ হয়ে গেছে। রাত্রি এগারোটা। সুতরাং সে বলেছিল—দে, তাই দে।

খেয়ে দেয়ে বিছানায় পড়বামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিল। শেষরাত্রে তেষ্টা পেয়ে উঠে জল খেয়ে আবার শুয়েছিল। তখনই ক্ষতস্থানটা একটু টন টন করছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন ওটা হুইস্কীর প্রভাবে কিনা ঠাণ্ডর হয় নি। একটা সারিডন খেয়ে শুয়ে পড়েছিল।

তখন থেকে এখন বেলা সাড়ে আটটা পর্যন্ত নাগাড়ে ঘুমিয়েছে।

সকালবেলা উঠে মনে হয়েছে ব্যথার কথা। মুখ ধুতে গিয়ে হাত লেগে টন টন করে উঠেছে। আয়নায় দেখে দেখলে একটু ফুলেছে। বেশি না—সামান্যই। তবু ফুলেছে। কালো মেয়েটিকে মনে পড়ল।

* * * * *

চড়ুই পাখীটাকেও মনে পড়ল। সে পিছনের দিকে আলমারীটার দিকে ঘুরে তাকালে—নেই, পাখীটা উড়ে গেছে। আলমারীটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এঃ, রঙের বাক্সটার উপরটা ময়লা করে দিয়ে গেছে। পাঁউরুটির গুঁড়োগুলি তেমনিই ছড়ানো আছে। জলটা উল্টে পড়েছে।—তাহলে জল খেয়েছে। যাক্, গেছে ভালোই হয়েছে। আবুহোসেনের বাদশাহীর মতো এইসব উদ্ভট কল্পনা রোমান্টিসিজম্ একরাত্রির স্বপ্নের মতোই হওয়া উচিত। আবার মনে পড়ল কালো মেয়েটিকে। কোনখানে ওর রূপ দেখেছিল—ভাবতে চেষ্টা করলে সে। রাবিশ্। কোথাও একফোঁটা রূপ নেই মেয়েটার। শুধু চুল। এবং সরু অথচ লম্বা টানা চোখ দুটিতে ফোঁটারও একটু, সিকি ফোঁটা শ্রী আছে।

সহমরণের দেশ—সতী বাতিকের চাপায় নিশ্বাস নিতে হয়, ঘোমটা বর্ম ছাদিতা, অন্তঃপুর দুর্গবাসিনী নারীকুল যেখানে—সেখানে অনন্তকাল ধরেই স্বাধীন প্রেমের দুর্ভিক্ষ! সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কঙ্কাল একজন; পাস্টবিনের চারিপাশে ঘোরার মত চৌরঙ্গীর বারে ও ধারে ঘোরে; কালকের সেই রঙ মাখা ব্রনওয়ালা ফিরিঙ্গী মেয়েটাকে দেখে চঞ্চল হয়, রোমান্স খোঁজে. এমনই যার আসল স্বরূপ—সে ওই কালো একটি মেয়েকে দেখে আদ্ধেক রাত্রি মদ খেয়ে নানান কল্পনা করবে তার আশ্চর্য কি। যাক, সকালে নেশা কেটে আসল বাস্তববাদী মডার্ন মনুষ্যটি কবর ঠেলে উঠেছে এই সৌভাগ্য। গুড লাক্, আনন্দ, গুড লাক্!

ওঃ, কাজ কত!

ক'খানা বইয়ের কভার ডিজাইন। সুধীন মুখুজ্জের তাগাদায় কলেজ স্ট্রীট মুখো হবার জো নেই। উইলিয়ামস-এর ওষুধের প্যাকেট এবং খেলের ডিজাইনগুলো না দিয়ে কাজ কাজ নয়। তার ভাতঘর।

—হরিয়া। হরি—। হ-রি-য়া—

কোথায় গেল? বাজার? তাহলে চা-টা নিজেই করে নিতে হয়। পারে সে সব। সব পারে। করেছেও তা। আজ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সে বাসা করেছে, হরিয়াকে রেখেছে। মাসে চার-পাঁচশো সে রোজগার করে, কিন্তু দুবছর আগে পর্যন্তও এসব ভাবতে পারে নি সে। ভাগ্য ছাড়া একে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

অনেক কাজ আছে। নিজেই চা ক'রে খাবার জন্য রান্নাঘরে ঢুকল সে। চা খেয়ে বাথরুম গেল। স্নান সেরে নেবে, মাথাটার মধ্যে নেশার প্রতিক্রিয়ার কেমন একটা অস্বস্তি রয়েছে। মনের ভিতরটাও যেন অপরিচ্ছন্ন ঝাঁট না-দেওয়া না-মোছা ঘরের মতো হয়ে রয়েছে। শুধু অপরিচ্ছন্নতাই নয়। সারারাত্রি বন্ধ ঘরের মতো একটা ভ্যাপসানি যেন মেজাজকে ভার করে রেখেছে। স্নান করলেই পরিচ্ছন্ন হবে মন। জানালা খুলে দেওয়া ঘরের মতো

আলোয় বাতাসে উজ্জ্বল এবং হাল্কা হয়ে উঠবে। কাজ ওই সাকা হাল্কা মন ছাড়া হয় না। নোংরা মনের কাজে তার ছাপ পড়বেই। রঙ তুলি নিয়ে কাজ তার, সে তো জানে—তুলি ছেড়ে অন্য কাজে হাত দেবার আগে হাত ধুতে হবে। নইলে আঙুলে লাগা কালি কাপড় জামা থেকে মুখে পর্যন্ত লাগতে পারে। আবার তুলি ধরবার আগেও হাত ধুতে হবে। নইলে কোথায় কোন্ আঙুলের কোণে বা হাতে তালুর কোথাও লেগে থাকা দেওয়ালের রঙ বা মেঝের ময়লা নয়তো ঘামের ছোপ কাগজে ক্যানভাসে পড়বে, রঙের সঙ্গে মিশবে।

স্নানঘরে ঢুকে ঝাঁঝরি খুলে দিয়ে স্নান করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল এককালে সে স্নানের সময় মন্ত্র আওড়াতো—ওঁ সূর্যস্যমেতি মন্ত্রস্য প্রকৃতিচ্ছন্দ আপো দেবতা—। তারপরে ওসব ছেড়ে দিয়ে মন্ত্র পড়ার মতো ভঙ্গিতে আউড়ে যেতো—যে করবে পুণ্য তাকে শাপমুক্তি—যে করবে পাপ তাকে আশীর্বাদ—বিনা আশীর্বাদেই সে সাত বেটার বাপ। মনে পড়তেই হাসি পেল।

ওঃ! জলের ধারা ঝরঝর ক'রে মাথায় গায়ে ঝরে পড়তেই মনটা হাল্কা হয়ে গেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চুল আঁচড়ে কাজে বসল। মুহূর্তে আনন্দ পাল্টে গেল। এ আনন্দ আর এক আনন্দ। আনন্দ নিজেও তা জানে। একটা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন মানুষকে দেখা যায়। একটা মানুষের মধ্যে দুটো তিনটে চারটে—এমন কি পঞ্চপাণ্ডবেরও বসবাস সম্ভব। ধার্মিক, সত্যবাদী, ঔদরিক, ক্রোধী, নারীবিলাসী, মিলিটারি এক্সপার্ট, অশ্ববিদ, একজন মোটরবিদ্ হতে পারে, জ্যোতিষবেদ—একটা মানুষই হতে পারে। আবার সেই বর্বর যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত সব যুগের মানুষই এই যুগের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে। দুর্যোধনেরা একশো ভাই—কিন্তু আসলে ওরা একটি। ওদের ভাগ্যে দ্রৌপদী জুটতেই পারে না।

রাম্ কহো। ছোড়ো। ও সব চিন্তা ছাড়ো। উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ, আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ। কাগজ নিয়ে বোর্ডে এঁটে সে রঙের পাত্র এবং তুলি তুলে নিলে।

হরিয়া এসে দাঁড়াল।—জলখাবার দি।

—কি করেছিস?

—ডিম ভেজেছি।

—তার সঙ্গে রুটি দু টুকরো। বাস্।

—মিষ্টি?

—না। কাল যা খাইয়েছিস!

—লোক এসেছে। বাইরে দাঁড়ায় আছে। একখানা কাগজ দিলে সে। আনন্দ পড়লে।

জর্দাওয়ালা রামেশ্বর। জর্দা বেচে বিখ্যাত হয়েছে, পয়সা করেছে। এখন কৌটোর প্যাকেটে রঙীন মোড়ক করবে। টাকা অগ্রিম দিয়ে গেছে। কাজটা হয় নি। মনটা খিঁচড়ে উঠল। ভুরু কুঁচকে ফুটে উঠল সেই বিরক্তি। কিন্তু উপায় নেই—তিন মাস টাকা

নিয়ে রেখেছে। মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললে—যা, বলগে আপনার কাজই করছে কাল এসে নিয়ে যাবেন। এখন দেখা করতে গেলে সময় যাবে। আপনার কাজই নষ্ট হবে।

হরিয়া চলে গেল। আনন্দ বললে—রাবিশ! চুপ ক'রে বসে রইল কিছুক্ষণ। হয়েছে। একটি পদ্ম—তার মধ্যে জর্দার কৌটো। একটি মেয়ে, তার এক হাতে পান অন্য হাতটি—ডান হাতটি বাড়িয়েছে জর্দা নেবার জন্যে। নিচে লেখা হবে—ও হরি! রামেশ্বরের জর্দা! আমি ভেবেছি পদ্ম! ওই যে বিলাসিনী স্থূলকায়া পক্ককেশী সুরূপা সুহাসিনী গরবিনী ধনী পার্কে আসেন নিত্য—ওকেই এঁকে দেবে।

খুশি হয়ে নিজেই বললে—গুড। ভেরি গুড!

কাগজের উপর পেন্সিল চালিয়ে স্কেচ শুরু করলে এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে মগ্ন হয়ে গেল। এ বেলাতেই সারতে হবে এটাকে। এ বেলাতেই! ওবেলা থেকে উইলিয়মস কোম্পানির কাজ!

সে আনন্দ পারবে। পারে সে। তার সে কিম্মৎ আছে।

ওঃ এক সময়—একদিনে পাঁচটা স্কেচ শেষ করে কাগজে যোগান দিয়েছে। ১৯৪৩।৪৪ সালে দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের সময়।

আজও সে শক্তি তার আছে। পেন্সিল তার হাল্কাটানে চলেছে।

প্রৌঢ়ার মুখখানা একটু ভেবে নিলে: হ্যাঁ। গালে একটা কি দুটো পান পোরা আছে। একদিকের গাল আবের মতো ঝুলছে। কিন্তু তবুও সৌন্দর্যহানি হয় নি।

ঠিক আসছে। আজও সে শক্তি তার আছে।

তবে সেদিনের সে ক্ষোভ সে জ্বালা আজ তেমনটি নেই। আছে কিন্তু উগ্রতায় উত্তাপে ঠিক তাই নয়। ফায়ার। সেদিন ছিল শুধু আগুন। আজ আগুন জল একসঙ্গে। স্টীম হচ্ছে—ইঞ্জিন চলছে। সেদিন ছিল ঘরের মাথায় মাথায় বৈশাখের দুপুরের ছুটন্ত অগ্নিবর্ণ বুনো ঘোড়ার পাল। লাগাম বাঁধা নয় বন্য উন্মত্ত খুরে খুরে মাঠ ক্ষেতের ধুলো ওড়া ঝড়ের মতো। মন্বন্তর নেই আর। দুর্ভিক্ষ নেই। অভাব আছে। তিরিশ টাকা চালের মণ চার-পাঁচ টাকা মাছ—তা হোক, অভাবই বলতে হবে, দুর্ভিক্ষ নয়। ইংরেজ চলে গেছে। দেশ স্বাধীন। তার রোজগার আজ তিন-চারশো। সেদিন তার তিরিশ টাকা কেন তের টাকাও আয় ছিল না।

উনিশ বছর বয়স। আশ্রয়হীন। মামার বাড়িতে ছেলেবেলা বড় হয়েছিল। আরও ছেলেবেলা পাঁচ বছর বয়সে বাপ মারা গিয়েছিল। নিতান্তই কেরানী চাকরে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হাজার আড়াই টাকা নিয়ে মা এসেছিল মামাদের আশ্রয়ে। মা মামাদের ভাত রান্না করতো, ভগবানকে ডাকত, স্বামী অর্থাৎ তার বাপকে গাল দিত, সঙ্গে সঙ্গে তাকে এবং তার ছোটকে। বড়ভাই ভাল ছেলে, বি. এ. পাস করে খড়গপুরে রেলে ঢুকেছে। সে দাদার থেকে তিন বছরের ছোট, ম্যাট্রিক বার দুই ফেল করে ইস্কুল ছেড়ে প্রাইভেট দেবে বলে ঘরে বসেই আছে। ঠিক বসে আছে নয়, এই ছবি দেখে ছবি কপি করছে। স্কেটে করত।

কাগজেও করত। একদিন মামার বাড়িতে একটা কাণ্ড ঘটেছিল। বাড়ির ড্রেন পায়খানা নিয়মিত সাফ করে না বলে উগ্রচণ্ডী মামী রাণীয়া জমাদারনীকে শাসন করতে গিয়েছিল। মাথায় খাটো মুখখানা খাপচো তাতে বসন্তের দাগ; মাথায় চুলগুলো কাফ্রি ধরনের রাণীয়ার। মামী উগ্রচণ্ডা হলে প্রচণ্ডা চামুণ্ডা। মামী বকাবকিতে হেরে একখানা ঘুঁটে ছুঁড়ে রাণীয়াকে মেরেছিল; মুহূর্তে ক্ষিপ্তা রাণীয়া তার মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে তাকে তেড়েছিল। মামী রান্নাঘরে ঢুকেছিল নিরাপদ স্থান ভেবে, কিন্তু রাণীয়া তা মানে নি। সে ঝাঁটা উদ্যত ক'রে ঘরে ঢুকতে পা বাড়িয়েছিল, তখন উপায়ান্তর না দেখে মামী তুলেছিল আঁশবঁটি। তারপর কাণ্ড অনেক দূর এগিয়েছিল, প্রায় এদিকে কোর্টের বার লাইব্রেরী ওদিকে মিউনিসিপালিটির কমিশনার মিটিং পর্যন্ত।

মামী মামাতো ভাইদের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না। মায়ের সঙ্গে ভাবটা যে কি—তা সে আজও ঠিক অনুমান করতে পারে না। তবে মা তার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। গালাগাল মাও কম করত না।

দু-দুবার ফেল করার পর মামা-মামী বার বার বলত—আবার পড়া কেন? বেশ তো প্রাইভেট দিবি তো সে তো চাকরি নিয়েও দিতে পারবি। মিথ্যে ঘরে ব'সে অন্নধ্বংস কেন? আর তোকে ভাত দিতে পারব না।

সে বলত—আমার মা তোমাদের ঘরে বিনা মাইনেতে ভাত রাঁধে। কাপড় পর্যন্ত দাও না। মা কিনে পরে বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা থেকে। আমার অন্ন মায়ের মাইনে থেকে হয়।

মা বলত—তুই মর মর মর!

—মরব। তার আগে বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার ভাগ আমাকে মিটিয়ে দাও। ভাইকে বল, ধার বলে যা নিয়েছে ফেলে দিতে। ধার—ভাত! টাকার সুদ দেয় তোমার ভাই!

সে যে এমনটা কেন হয়েছিল বলতে পারে না। তবে হয়েছিল। এরই মধ্যে সে এই মামী ও রাণীয়ার কাণ্ডটা নিয়ে একটা ছবি—ছবি অবশ্য সাদা কাগজের উপর কালিতে এবং পেন্সিলে—এঁকে দিয়েছিল ওখানকার হাতে লেখা পত্রিকায়। নাম দিয়েছিল—উগ্রচণ্ডা ও চামুণ্ডা। একদিকে সারিবদ্ধ উকীল মোক্তার ভদ্রলোক, অন্য দিকে সারিবদ্ধ জমাদারেরা।

ছবিটার তারিফ হয়েছিল। ওখানকার নেতা (বামপন্থী) তাকে ডেকে বলেছিলেন—ভালো হয়েছে। ওটা আমি কলকাতার কাগজে ছেপে দেব।

বিপদ হল ওইখানে।

ছাপা হ'তেই নজরে পড়ল লোকের। তাতেও কিছু হ'ত না, কিন্তু মামী এবং রাণীয়াকে স্পষ্ট চেনা গিয়েছিল।

ফল বিপর্যয়।

মা মাথা ঠুকে কপাল কাটিয়েছিল। মামা মামাতো দু ভাই তার সঙ্গে তার নিজের দাদা, ভডফ্রাইডের ছুটিতে দাদাও বাড়ি এসেছিল, সব মিলে চারজনে তাকে ধ'রে প্রহার করেছিল।

সে মার খেয়ে নীরবেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেই এসেছে। বাস্। আর ফেরে নি। ফিরবেও না কোনদিন।

কলকাতায় তাকে প্রথমটা সাহায্য করেছিলেন সেই বামপন্থী নেতাটি। বেশিদিন সাহায্য করতে হয় নি, মাস কয়েক। সে তখন কলকাতায় ঘুরে ঘুরে দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকত। সাদায় কালোয় ছবি।

জয়নাল সাহেব তখন ওই ছবির জন্য বিখ্যাত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুলো। সাদা কালো ছেড়ে রঙ ধরলে। মেসে থাকত। মেস থেকে বোর্ডিং—একলা একটা রুমে। তারপর নিজের একখানা ঘর। নিজে রান্না। তারপর এসেছে হরিয়া।

সে তখন ছিল ফায়ার। এখন জলে আগুনে স্টীম।

—খেলেন নাই!

হরিয়ার কণ্ঠস্বরে তার ধ্যান ভাঙল।—কি?

—খাবার।

—কখন দিলি? বলে দিতে হয় তো!

—বললাম যি?

—বলেছিলি কি? তা হলে শুনতে পাই নি আমি। দুধটা একটু গরম ক'রে আন।

কাজ করতে বসে এমনই ডুবে যায় আনন্দ। কিছুক্ষণ কাজ ক'রে সেটাকে সে সরিয়ে রেখে দিলে। টাকা চাই। কিছু স্কেচ নিয়ে উইলিয়মসে যেতে হবে, দেখিয়ে টাকা আনতে হবে। না। আবার সেটাকেই টেনে নিলে। ওটাকেই শেষ করে দেবে সে আজ। একখানা চেক্ নিয়ে হরিয়াকে দেবে—ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনুক। কাজে অসৎ হলে চলবে না। যেখানে খুশি মিথ্যে বলো, কাজের ক্ষেত্রে মিথ্যে কথা বলো না। অন্তত—খুব বড়োর কাছে বলো না—আর একদম ছোটোর কাছে বলো না। মাঝারিদের কাছে বলতে পারো, দরকার হ'লে বলো। আবার তুলি চালাতে লাগল। টানে টানে বিলাসিনী প্রৌঢ়া সুলাঙ্গী ফুটে উঠেছে। হঠাৎ ক্রি-রিচ-ক্রি ক্রি, ক্রিরির ক্রিরির-ক্রিচ-ক্রিচ-ক্রিচ শব্দের সঙ্গে পাখার ফরর্ ফরর্ শব্দে সে চমকে উঠল। হ্যাঁ চমকেই উঠল। চড়ুইটা ঘরে এসে ঢুকেছে। মুখ তুলে সে দেখলে। হ্যাঁ—সেইটে এসেছে। সেইটেই। মাদী চড়ুই। ধূসর রঙ, গলায় সরু একটা কালো বেড় হারের মতো।

—তুমি আবার এসেছ? কি সংবাদ? আজ কে তাড়া দিলে?

—কেউ না?—না?—ওই যে একজন। একটা লালচে চড়ুই গলায় কালো ত্রিভুজ—জানালার দিকে বসেছে। ওই নরাধম তোমার পশ্চাদ্ধাবন করেছে! এবং তুমি ওকে পছন্দ কর না। অথবা এটা তোমার প্রণয়লীলার একটি অঙ্গ! আমাকে তুমি নারীরক্ষক বীর ভেবেছ! তোমার এ প্রকার বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ!—যাও, তুমি যাও হে!—

আনন্দ ডান হাতের তুলিটা উল্কে নারীলোলুপ পুরুষ চড়ুইটাকে তাড়া দিলে। তাতে সেটাই শুধু উড়ে গেল না, এটাও ত্রস্ত হয়ে ঘরময় দুপাক উড়ে—ফুড়ুৎ করে জানালা দিয়ে

উড়ে বেরিয়ে গেল। আবার সে কাজে মন দিলে। তুলি নিয়ে বসল। চলতে লাগল তুলি। কিন্তু মন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তুলি রেখে সে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। এগারটা বেজে গেছে। রোদ আজ চড়া মনে হচ্ছে। গরম হাওয়া আসছে। বাইরে, পার্কের ওদিক-টার বড় ওয়ানওয়ে রোডে লরী বাস প্রাইভেট চলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে। একবার এক ঝাঁক, তারপর একটু বিরতি, আবার এক ঝাঁক। দেখ—দেখ—দেখ—। একটা বাস আর একটাকে ওভারটেক্ করছে। লাগল বোধ হয়। না—বেরিয়ে গেল। প্রথম বাস-খানাই—ডাইনে চেপে—পিছনেরটার পথ মেরে জোরে বেরিয়ে গেল।

একখানা বাস থেকে হরিয়া নামল। ব্যাঙ্ক থেকে ফিরছে।

হরিয়া তার জীবনের একটা সম্পদ। এই তো ঘণ্টাখানেক আগে গেছে।

আঃ! আবার তার কানের পাশ দিয়ে চড়ুইটা ঘরে ঢুকল। মরেছে—এটা কি ভেবেছে! পাখীতেও কি ভাবে নাকি? ভাবে বইকি! নইলে তাকে গ্রাহ্য না ক'রেই ঘরে ঢুকল কি হিসেবে? অবশ্য হ'তে পারে, ওরা মানুষদেরই গ্রাহ্য করে না, বা মানুষকে জানে এই বলে যে—ওরা গ্রাহ্য করবার মতো জন্তুই নয়। শুধু ঘরটাকে ওর চেনা হয়েছে এবং নিরাপদ স্থান বা মনোরম স্থান বলে ধারণা হয়েছে।

হায় হায় হায়! তুমি জানো না, কার ঘরে তুমি ঢুকেছ—এইবার জানালা ক'টি বন্ধ ক'রে, তোমাকে তাড়া দিয়ে এখুনি ধরে ফেলে মেরে ফেলতে পারি। মরা তুমিকে ছুঁড়ে কোন কাককে দিয়ে দিতে পারি, অথবা তোমাকে ভেজে খেয়েও ফেলতে পারি। অবশ্য—তাহলে হরিয়াকে এখুনি পাঠাতে হবে মদের দোকানে। কিন্তু তার সময় এ নয়।

চড়ুইটা উড়ছে। ওই ঘরের কোণে বসল। আবার উড়ল। হোল্ডারে বসল—আবার উড়ল। এবার ও কোণে বসল। আবার উড়ল—কালকের আলমারিতে বসল।

চিরিক—চিরিক। চিক—চিক—চি—।

সঙ্গে সঙ্গে লেজটা নাচছে। গলার কাছটায় কাঁপছে। মাথাটা চঞ্চল ভঙ্গিতে নড়ছে। এপাশ ওপাশ—কখনও উপরের দিকে তাকাচ্ছে। কখনও নিচের দিকে। মধ্যে মধ্যে ঠোঁট খসছে। লাফাচ্ছে নাচার মতো।

সামনের দেওয়ালে ব্রাকেটে একটা পুরনো ক্লক ঘড়িতে ঢং শব্দ করে সাড়ে এগারটা বাজলে সে ফিরে এসে কাজে বসল। বসেই সে শুনলে—ক্রিরিচ—এবং ফ্রর-র্। পাখীটা পালাল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে—ওই পাখার আওয়াজে বোঝা যায়। ঘরের মধ্যে ফ্রর শব্দ—বাইরে গেলেই হাল্কা হয়ে পড়ে। সিনেমার ফেড আউট।

সিনেমার পাবলিসিটি অফিসার বন্ধুটি এক নম্বরের চালিয়াৎ। সেদিন সিনেমা ড্যান্সার ব'লে একটা সস্তা বারে নিয়ে যা দেখালে!—

তার থেকে বউবাজারবাসিনী ব্রনশোভিতাবদনী ফিরিঙ্গিনী মেমসাহেব লিপস্টিক রুজে এবং সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ানোর কায়দায় স্যুইরর্কবাসিনী।

রাবিশ! হঠাও ও সব চিন্তা। হট্ যাও। রামেশ্বরের জর্দার পালায় পর্দা নিক্ষেপ আজ করতেই হবে। তুলি চলতে লাগল। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। সে কাজ ক'রেই চলেছে।

ঢং—সাড়ে বারোটা। ঢং—একটা। ঢং—দেড়টা।

—হরিয়া এসে দাঁড়াল—খাবার দিব ?

—এঁ্যা।

—দেড়টা বাজি গেল।

—বাজুক।

আবার ঢং ঢং। দুটো। হরিয়া এসে দাঁড়াল। মনিবের একাগ্র মনে তুলি চালানো দেখে ফিরে গেল। আরও কিছুক্ষণ পর আনন্দ কাজ শেষ করে উঠল। রামেশ্বরের জর্দা খতম।—হরিয়া! খাবার! ঘড়ির দিকে তাকাল—দুটো পনেরো। গরম হাওয়া বইছে। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। ওঃ। নিজেই সে জানালার পাল্লা টেনে দিতে লাগল।

ক্রিচ—ক্রিচ—ক্রিচ—ক্রিচ্!

তার সঙ্গে ফ্রর্ ফ্রর্ শব্দে ঘরখানাকে মুখরিত করে চড়ুই উড়ছে। সেই চড়ুইটা। ধূসর রঙ, গলায় হারের মতো কালো বেড়—ত্রিভুজওয়ালাদের থেকে আকার একটু বড় কিন্তু দেখতে সুন্দর। সেই নারীটি। কখন এসে আবার ঘরে ঢুকেছে। বাইরের রৌদ্রে উত্তাপ এখন, সব পাখী এমন কি কাকগুলোও গাছের পল্লবের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে। ধুঁকছে। সবারই গলার কাছটায় ধুক্ ধুক্ করছে। ইনি—কালকের পরিচয়ে ঘরখানিকে জেনে এর মধ্যে এসে বসেছিলেন। বাইরে থেকে ঘর অনেক ঠাণ্ডা।

উড়ছে। ও ভাবছে—জানালা বন্ধ করছে যখন তখন ওকে ধরবে। অথবা অন্ধকারের ভয়।

খানিকটা ভয় দেখালে কি হয় ? ভয় কেন ? যাক। বন্ধই থাক না ঘরে। শ্রীমতী যখন আনন্দ রায়ের ঘরে ঢুকেছ, তখন কলঙ্ক না নিয়েই ফিরে যাবে ? থাক। বিকেলে উঠে আনন্দ জানালা খুলে দেবে তখন বেরিয়ে যাবে। বাইরেটা তখন ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। পুরুষ চড়ুইয়েরা কল কল করবে। কলঙ্কিনী বলবে। সে বন্ধ করে দিলে জানালাটা। অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা ফর ফর করে উড়ে অসহায় বন্দিনীর মতো কোনো কোণে আশ্রয় নিলে। আনন্দ শুয়ে পড়ে বিছানার পাশে রাখা টেবিল ফ্যানটার সুইচ অন্ ক'রে দিলে। ঘরে সিলিং-ফ্যান রাখেনি আনন্দ। টেবিল ফ্যান রেখেছে। খুব গরমের সময় ভিতর দিকে বারান্দায় শুয়ে টেবিল ফ্যানটা খুলে দিতে পারে। ফ্যানটা ওঁ-ওঁ শব্দ করে ঘুরতে লাগল—আঃ।

চড়ুইটা এখন খুব মৃদু একটা শব্দ করছে—চিনিক্ চিনিক্। চিনিক্ চিনিক্।

ওটা বোধ হয় ক্লান্তি বা অসহায় অবস্থার শব্দ। বেরুবার উপায় নেই। হেসে আনন্দ বললে—ছেড়ে দিতে পারি তোমাকে, যদি সেই কালো মেয়ে, যার দূতী হয়ে এসেছিলে, সে যদি আসে। বুঝেছ ? সে চারটার সময় যাবে তখন জানালা খুলে দব. তুমি গিয়ে তাকে ডাকবে। একটু হাসল সে। তারপরই ঘুমিয়ে পড়ল। ভাবতে ভাবতেই ঘুমোল—সকাল সকাল উঠতে হবে। কিছুকাল কলেজ স্ট্রীট যায় নি। ওখানটা ঘুরে মিশন রো। উইলিয়মসকে বলে আসবে দু-তিন দিনের মধ্যেই আদ্ধেক কাজ সে দেবে।

বউবাজার থানার সামনেটা মনে ফুটে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

ব্রনমুখী, খাটো ফ্রক পরা, সিগারেটের ধোঁয়া আকাশে নিক্ষেপকারিণী কার দিকে সিগারেটের ধোঁয়া ছোঁড়ে? সে খুশি হবে যদি সে ঈশ্বরের দিকে ছোঁড়ে। ওরই মধ্যেই তো নীতির গুদাম। সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রলুব্ধ হয়ে নীতি মরালিটি—সিগারেট খেতে শিখুক না।

ঘুম কিন্তু ভাঙল দেরিতে। পাঁচটার কাছাকাছি। ঘুম ভেঙেই প্রায় ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। ক'টা বাজল? ঘড়ির সাদা ডায়েলটা দিনের বেলা দরজা জানালা বন্ধ সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে। পাঁচটা বাজতে দু'তিন মিনিট। এঃ! ছত্রধারিণী মুক্তকেশী দীর্ঘাঙ্গী কৃষ্ণা চলে গেছে। বউবাজারের থানার সামনে দিয়ে ব্রনমুখীও সিগারেটের ধোঁয়া আকাশে ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে গেছে। কলেজ স্ট্রীটে যেতে যেতে দোকানে দোকানে ক্যাশ মেলাবার পালা পড়বে। উইলিয়মসের জু সাহেব হয়তো বেরিয়ে যাচ্ছে। না গেলেও সে যাবা মাত্র বলবে—সরি রয়! আমি উঠছি। দেরিতে এসেছ। কাল ফার্স্ট আওয়ারে এস। স্কেচ দেখব। বাই-বাই!

টং টং শব্দ উঠতে লাগল, পাঁচটা বাজছে।

সিগারেট বের করে মুখে পুরলে সে, দেশলাইয়ের কাঠি বের করলে। হঠাৎ চ্রিরিক, চঞ্চল চ্রিক-চ্রিক-চ্রিকের সঙ্গে পাখার শব্দ উঠল। চড়ুর চড়ুই তো। ঠিক বুঝছে, উঠে বসেছে! বলছে, কথা রাখ, জানালা খোলো, যেতে দাও এবার। যা করলে—

আরে। আরে! তা তো না! উড়ে গিয়ে ঘড়িটার মাথায় বসেছে। টং—টং—টং—টং শব্দে বেজে চলেছে আর চড়ুইটা ঠোঁট দিয়ে ঘড়িটায় ঠোক্কর মারছে।

সবিস্ময় কৌতুকে আনন্দ সেই দিকে তাকিয়ে রইল—বা রে!

ঘড়িটার বাজনা থামল—পাঁচটা ঘণ্টা ফুরিয়ে গেল। চড়ুই আরও বার কয়েক ওটাতে ঠোক্কর মেরে থামল, ঘাড় কাত করে কয়েক সেকেণ্ড, অন্তত বিশ সেকেণ্ড তাকিয়ে দেখল, তারপর আবার ফ্রর্‌র্‌ শব্দে পাখা মেলে জানালার গায়ের শিকে বসল। বাইরের পড়ন্ত বেলা ওকে ডাকছে। প্রাণ ওর ছট্‌ফট করছে।

ক্রিরিচ্‌—ক্রি-রিচ—ক্রিচ—ক্রিচ—ক্রিরিচ—

তারপর থেমে মৃদু কিনিচ—কিনিচ।

আহা-হা। সিগারেট না ধরিয়েই আনন্দ উঠল। জানালাটার কাছে যেতেই পাখীটা উড়ে গিয়ে বসল আলোর হোল্ডারে। আনন্দ জানালাটার এক পাট খুলতেই একটি সুউচ্চ সুদীর্ঘ ক্রি-রি-রি-চ ডেকে—একটি সোজা রেখা টেনে মুহূর্তে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আঃ, বেচারা বাঁচল। একটু হেসে আনন্দ সিগারেট ধরিয়ে ডাকলে—হরিয়া!

—যাই। হরিয়া 'যাই'টি বলে ভারী চমৎকার। একটি সুর আছে। তার সঙ্গে সস্নেহ আনুগত্য।

—আসতে হবে না—চা নিয়ে আয়।

জানালার বাকী পাল্লাগুলি এবার খুলে দিলে আনন্দ।

পড়ন্ত বেলায় দেবদারুর কচি পাতায় আলো চিকচিক করছে। আজ একটা হাওয়া এর

মধ্যেই উঠেছে—কলকাতার সুবিখ্যাত সমুদ্রস্পর্শবহ বাতাস। গ্রীষ্মের আরাম। আজ প্রথম উঠেছে। তবে তো আজ ময়দানে যেতেই হবে। আকাশ পরিষ্কার। হরিয়া—চা আন, জলদি।

শিমুল ফুল জাতীয় লাল ফুলগুলো আলোতে চকচক করছে। একটা ফুল খসল। ফুটবল নিয়ে একটু কি একফালি খোলা জায়গার সন্ধানে বাচ্চা ছেলের দল চলেছে। পার্কে ওদের খেলতে দেয় না। ওপাশে জিমখানার মাঠে বড়দের খেলার আসর। তারা—ওই যে একদল যাচ্ছেন—সিগারেট ফুঁকছে, হেসে ঢলে পড়ছে, এ ওকে ঠেলছে এবং পার্কের ওদিকটায় মেয়েদের দেখে এসে তাই নিয়ে গাঁজানো রসিকতার স্বাদে মুখ পাকলাচ্ছে। এযুগে এটা—এ যুগেই বা কেন—সব যুগেই আদিকাল থেকে আদিরস আছেই। তারা নিজেরাও করে। সেও করে। ঘরে বসে ভাবনার মধ্যেও করে। পাখী সবাই—এগুলো নেহাতই কউয়া। কাক। ওই একদল মেয়ে আসছে। স্কুলের ডবল বেণী; যুবতী হয়েছে, সেই স্বপ্নের ঘোর লেগেছে। সবে শাড়ি ধরেছে। দুটো মেয়ের এলো চুল। ছোট্ট বাচ্চা একটা ওদের পিছনে ট্রাইসিকিল চড়ে আসছে, সঙ্গে মা—মা একটা প্যারাম্বুলেটর ঠেলছে। এবার ছোঁড়ারা ফেনিয়ে বোধ হয় উপচে পড়বে। এবার একজনকে একজন ঠেলা দেবে। প্রাণপণ জোরে ঠেলা মারবে, হয়তো সে পড়তে পড়তে সামলাবে এবং হঠাৎ খুব রেগে গিয়ে উচ্চ বীর চীৎকারে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবে। ভগবান আশ্রিত এদেশের নীতিজ্ঞান সিগারেট ধরলে বাঁচতো, খায় না বলে ঘরের কোণে লুকিয়ে গাঁজা খায়। তার ফলে এই অবস্থা।

পাশের একটা গলিপথ থেকে ছাতা মাথায় দিয়ে লাঠি হাতে থপ্‌থপে বৃদ্ধটি বেরিয়েছে। ধপধপে সাদা রং—চুল ভুরু সব সাদা। ভুরুগুলো খুব বড়। বিচিত্র দেখায়। থপথপ ক'রে হাঁটে। যখন বের হয় তখন ছাতা লাঠি ছাড়া বের হয় না। ওকে দেখে আনন্দ বুঝতে পারে জরা দেখে গৌতম বুদ্ধ এত বিচলিত হয়েছিল কেন? বৃদ্ধের শবযাত্রা তাকে যেন দেখতে না হয়। তাহলে কে বলতে পারে গৌতমের তৃতীয় পাদে সে পা রাখছে না। বাকী থাকবে সন্ন্যাসী—। এদেশে ভালো সন্ন্যাসীরও অভাব নেই। তাহলেই সেও নির্বাণকামী হয়ে বেরিয়ে পড়বে।

—চা এনেছি।

হরিয়া পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকছে। ফিরে দাঁড়াল সে। টিপয়ের উপর ডাইজেস্টিভ বিস্কুট আর চা নামিয়ে দিয়ে হরিয়া দাঁড়িয়ে আছে। তরিবতে হরিয়া যাকে বলে অপরাজেয়! এমন পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিকতা-দুরস্ত হরিয়া যে এইটুকু প্রশংসা ওর সম্পর্কে কিছুই নয়।

বিছনায় এসে বসল আনন্দ, বললে—যার হরিয়া নেই তার কেউ নেই।

খুশিতে হরিয়ার এক ধরনের দাঁত বের করে নিঃশব্দ হাসি আছে। হাসলে হরিয়ার গালের খাঁজ দুটো চমৎকার হয়। মধ্যে মধ্যে ভাবে আনন্দ।

—একটা মেয়েছেলে এসেছিল।

—মেয়েছেলে?

—হুঁ, কালো মেয়ে একটা—রোজ ছাতা মাথায় দিয়ে যায়—

—ও। এঃ—

এক ঝলক চা পড়ে গেছে আনন্দর কাপ থেকে। হরিয়া ব্যস্ত হয়ে উঠল পড়ে-যাওয়া চা মুছতে নিজের গামছাটা নিয়ে। আনন্দ বললে—থাক না।

—না, দাগ ধরে যাবে।

—কি বলছিল সে?

—শুধোচ্ছিল, বাবু কেমন আছে। চোখের কোণটা পাখীর নখে কাটিল—তা মুখ-টুখ ফুলিছে কিনা। জ্বর-টর হয়েছে কিনা।

—তুই কি বললি?

—বললাম, না কিছু হয় নাই।

—তা কেন বললি? এই তো একটু ফুলে রয়েছে?

অপ্রতিভ হয়ে গেল হরিয়া, মাথা চুলকে একটু হেসে বললে—সকালে তো বললে না। ডাক্তার দেখালে না। ওষুদ লাগালে না—। তাই—। দাঁত কটা বের করে হাসির একটা ভঙ্গি করে সে চুপ করলে।

এর উত্তর আনন্দও খুঁজে পেলে না। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—আমায় ডাকলিনে কেন?

—ঘুমাচ্ছিলে। সকাল থেকে দুটো পর্যন্ত কাজ করিছ। খুব ঘুমাচ্ছিলে। নাক ডাকছিল। আর মেয়েটা বললে—ডাকতে হবে নাই। দরকার কিছু নাই। কেমন আছেন তাই শুধাচ্ছি। ভাল আছেন, ঘুমাচ্ছেন, কাজ করছেন সকাল থেকে—ঠিক আছে।

চুপ করে বসে রইল আনন্দ। একটু দাঁড়িয়ে থেকে হরিয়া চলে গেল। চড়ুইটা আবার কখন এসে ঘরময় একটা পাক মেরে ডাকল—চিরিক! চিরিক! চিরিক। চিরিক। বিরক্ত হয়ে আনন্দ বললে—জ্বালালে তো এটা! ভাগ! ভাগ!

হরিয়া ফিরে এসে দাঁড়াল। তার কাজ আছে; আনন্দ বাইরে বের হবে, প্যাণ্ট জামা বের করে দিতে হবে। স্যুটকেস খুলে সে বললে—কালো প্যাণ্টটা দিব?

—দে।

—নতুন হাওয়াইটা দি?

—দে। যা ইচ্ছে দে। বিরক্ত করিস নে।

হরিয়া প্যাণ্ট সার্ট পাট খুলে হ্যাংগারে ঝুলিয়ে রেখে গেল। আনন্দ বসে রইল। চুপ করে বসে রইল। কেমন হয়ে গেল যেন। বাইরে দুটো বিপরীত রঙে মিলে সাদা রঙ হয় না। কালোও হয় না। সাদা কালো দুটোতে মেশালে কালচে হয়, সাদাটা কমজোরী হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মনে তার থেকেও বিচিত্র কিছু হয়। রঙছুট রঙ, বর্ণহীন রঙ তো নেই—বাইরের জগতে হয় না। মন কিন্তু সব রঙছুট হয়ে শূন্যরঙা হয়ে যায়। সাদাও না, কালোও না। ভালোও না, মন্দও না। উল্লসিতও না, বিষণ্ণও না। তেমনি হয়ে গেছে তার মন। মেয়েটি তার খোঁজ করে গেছে। তাকে কিন্তু ডেকে দিতেও বলে নি, অর্থাৎ আগ্রহও ছিল না। ভালো

খারাপ দুই মিশে মন এমনি হয়ে গেল। কল্পনাতেও মেয়েটিকে নিয়ে খেলা করতে পারছে না।

বাইরে কারা চীৎকার ক'রে হরিবোল দিয়ে উঠল। বিকট চীৎকার বল হরি—হরি—বো—ল। বল হরি, হরি—বো—ল। বল হরি—হরি—বোল। নাগাড় চীৎকার ক'রে চলেছে। বিরক্ত হয়েই সে উঠে দাঁড়াল। হাঁ, ছটা চ্যাংড়াতে একটা মড়া নিয়ে চলেছে। খুব দুঃস্থ কেউ মরেছে। খাটিয়াও জোটে নি। এরা পাড়ার বাউণ্ডুলে, মহানন্দে বিকট চীৎকারে হরিবোল দিয়ে মরণের কথা মনে পড়িয়ে ভয় দেখিয়ে ওরা চলে। অমৃতের উপাসক ওরা। মৃতসঞ্জীবনীরও উপাসক বটে তাতে সন্দেহ নেই। কবিরাজখানায় পাওয়া যায়।

রাবিশ। জানালাটা বন্ধ করে দিলে সে বিরক্তিভরে।

সঙ্গে সঙ্গে ফুরর্ শব্দে ঘরখানার স্তব্ধতা ভঙ্গ হল। সঙ্গে সঙ্গে দুপুরের মতোই সেই আতঙ্কিত চ্রিরিক, চ্রিরিক, চ্রিরিক, চ্রিরিক। চড়ুইটা আবার কখন এসে ঢুকেছে। না, বেরিয়েই যায় নি? লক্ষ্য তো করে নি আনন্দ! এ তো জ্বালাতন করলে!

যা—যা—। একপাল্লা জানালা সে খুলে দিলে।

পাখীটা বেরিয়ে গেল না, ওই খোলা পাল্লাটারই মাথায় বসল।—চ্রিরিক। চ্রিরিক। আনন্দের বিরক্তিটা একটু দ্রবীভূত হয়ে গেল চড়ুইটার ব্যাপার-স্যাপার দেখে। ও ভেবেছে কি? হঠাৎ আনন্দ সম্ভবতঃ ঘরে কেউ নেই বলেই পাখীটার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে—কি? দুপুরবেলা দরজা জানালা বন্ধ ক'রে তোমাকে আটকে রেখেছিলাম—আমার সঙ্গে দুপুর বাস করেছ বলে দাবী করছ নাকি?

—চ্রিক চ্রিক চ্রিক।

—কি? কালকে মুঠোয় চেপে তোমাকে ঘায়েল করেছিলাম?

মৃদুস্বরে পাখীটা ডাকলে চিনিক্। চিনিক্।

—উঁ—। হুঁ হুঁ। ভাল।

ঢং—ঢং—ঢং; ছটা বাজছে। পাখীটা চ্রি-রি-ক শব্দ করে চঞ্চল চকিত গতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘড়িটার উপর একটু উড়ে ঘড়িটার মাথায় বসল এক ঘণ্টা আগের মতো। তারপর নেমে বসল ব্রাকেটের উপর।

ঢং ঢং ঢং—

—চ্রিক—চ্রিক—চ্রিক—। ছটা বাজা শেষ করে ঘড়িটা শুধু পেণ্ডুলামের শব্দ করছে। পাখীটা বার তিনেক আবার চ্রিক চ্রিক শব্দ করে থামল। তারপর ঘড়িটার পেণ্ডুলাম ঢাকা কাঁচটায় দু-তিনটে ঠোক্কর দিয়ে একটি দীর্ঘ চ্রি—রি—ক শব্দে ক'রে বেরিয়ে গেল।

শিশুর হাসি অথবা ফুলভরা গাছ দেখে যে হাসি সকালের আলোর স্পর্শে ফুল ফোটার মতো মানুষের মুখে ফুটে ওঠে—সেই হাসি মুখে মেখে আনন্দ চুপ ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিকেলের রোদ্দুরে সন্ধ্যার শেড্ পড়েছে।

পার্কের গাছগুলির পাতা কলকাতার প্রসিদ্ধ বৈকালিক ঝড়ো হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে।

পত্রহীন শিমুল জাতীয় গাছ থেকে সে হাওয়ায় ফুল খসছে। সেই ফুল কুড়োচ্ছে ক'টি ছেলে-মেয়ে। একটি যুবতী যেতে যেতে ফুলগাছটার তলায় গিয়ে একটা ফুল কুড়িয়ে তার ডোনাট খোঁপায় গুঁজলে। হেসে ফেললে আনন্দ। 'কালো চুলে রাঙা কোসোম হেরেছ কি নয়নে'। মনে পড়ে গেল তার। কিন্তু এ মেয়ে সুন্দরী, অন্তত গৌরাঙ্গী।

এঃ! কালো কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটি এসে ফিরে গেছে!

—গেলে না? সন্ধ্যা হয়ে গেল! হরিয়া এসেছে।

মুখ না ফিরিয়েই আনন্দ বললে—না।

—যাবে না?

—না।

—চা করব?

—কর।

হরিয়া চলে গেল। আনন্দ তাকিয়েই রইল সামনের দিকে। পার্কের ওপাশের বড় রাস্তার উপর বাস যাচ্ছে, আলো জ্বেলে যাচ্ছে। ক'টায় লাইটিংয়ের টাইম? সম্ভবতঃ ছটায়। রাস্তার আলোগুলো কখন জ্বলে উঠেছে এতক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় বুঝতে পারা যাচ্ছে। এই ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে সারিবদ্ধ গাড়িগুলির চলন্ত আলো, বিশেষ করে ওই ওমাথার বাঁকটায় আশ্চর্য গতিশীল রূপের খেলা শুরু করে দিয়েছে। সব থেকে মনোহারী হয়েছে বাঁকের মাথায় গাড়িগুলির গতির মন্থরতা। পিচের রাস্তার উপর আলো-গুলির প্রতিবিম্ব পড়েছে। এ এক আশ্চর্য শোভা। মধ্যে মধ্যে পার্কের গাছগুলির আড়াল। বা-বা-বা!

হরিয়া চা নিয়ে এল।—চা!

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আনন্দ বললে,—বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারটা পেতে দে।

—দিচ্ছি। চা-টা কেমন? নতুন দিয়েছে দুকানদার।

—ভালো না খুব। প্যাকেট চা আনবি। ও সব লুব্ধ চায়ের আজকেরটা ভাল হবে, কালকেরটা পচা হবে।

—উ বললে কি না খুব ভালো চা। ফিরত দিয়ে আসব। আমি বলে রেখেছি।

—তাই দিস।

তবুও হরিয়া দাঁড়িয়ে রইল। হরিয়ার—শুধু হরিয়ার কেন, হরিয়া মধুয়া যদুয়া থেকে হরিনাথ যদুনাথ এমন কি মাধবেন্দ্র যাদবেন্দ্র পর্যন্ত সকলেরই স্বভাব হ'ল কোন সঙ্কোচের কথা থাকলে বলতে এসেও বলতে না পেরে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। তবে হরিয়ার কথা আলাদা। ও মনিবের সঙ্গের জন্যও অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকে। এমন ক্ষেত্রে আনন্দ যদি বলে, কিছু বলছিস্? তাতে হরিয়া বোকা হয়ে হেসে বলে, না এমনিই। আনন্দ হাসে। আজও আনন্দ বললে—কিছু বলছিস্?

তাতে হরিয়া বললে—মানুসো আনব?

—আনবি?

—শুধাচ্ছি!

—তা আন।

হরিয়া বললে—আর—

—কি?

—ব্রাণ্ডির দুকানে যেতে হবে নাকি? উ তো আটটাতে বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে গেলে না?

—না।

হরিয়া চলে গেল।

আনন্দ আবার ডাকলে—শোন, হরিয়া।

—যাই।

একটু পর এল হরিয়া। হরিয়া শৌখীন লোক। বাইরে সে কখনও প্যাণ্ট হাওয়াই সার্ট ছাড়া বের হয় না। বাংলা বই পড়ে। ইংরেজী শিক্ষা পড়ে। ইংরেজী লেখা মক্সো করে। বছরে একবার ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে ইংরেজীতে চিঠি লেখে, My dear Babu, I come home, I well. Mother well, Go very soon. সব থেকে ভালো লেখে শেষকালে—you Pronam.

হরিয়া সেজেগুজেই এল। বললে—বাইরে চেয়ার দিলাম।

—শোন। ব্রাণ্ডির দোকানে যাবি। পাইট না। ছোট কোয়ার্টার পাওয়া যায়, তাই আনবি।

—হুঁ।

—শিগ্‌গির ফিরবি। আর একটা কোলা নিয়ে যা। হাতে ক'রে আনিস নে। এখানকার লোক সব দেখে!

বাইরে ব'সে সে ওই পার্কের ওদিকের বড় রাস্তাটার বাঁকের মুখে মোটরের চলন্ত আলোর আশ্চর্য শোভার দিকে তাকিয়েছিল। এই রূপের খেলাটি এর আগে সে না দেখেছে এমন নয়, কিন্তু আজই সে খেলা আনন্দের মনে ধরা পড়েছে। বিস্ময় বোধ করছে যে, এর আগে সে দেখেও দেখতে পায় নি। তবে সে সন্ধ্যেতে তো প্রায়দিনই বাসায় থাকে না। কাল ছিল। কিন্তু কাল মেজাজ ছিল অন্য মেজাজ। কালো মেয়ের মুখ—তার সহানুভূতি মাখানো কথা; এ দুটো নিতান্তই কাল্‌চে চোরা বালি;—তার উপর মদের নেশার পাগলামিবশে কার্ডবোর্ডের গলিঘুঁচি—কোন কোণার এবং তারই সঙ্গে চিলে কোঠাওলা বাড়ি বানাতেই মত্ত ছিল। আজ বাড়িটা নেই, উড়েই যাক, আর ডুবেই যাক, গেছে। আজ চোখ পড়েছে। আজও মনটা মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে বাইরে বের হবার জন্য। হোটেলের বারে বন্ধুরা এতক্ষণ এসে জমে গেছে। বাক্যের অসিযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। যশোদা-দা—অশ্লীল রসিকতার আমীর। এক-একখানি ছাড়ছে—আর মদের গ্লাসের মদের নেশায় বুঁদ হয়ে যাচ্ছে। হোয়াট নট যশোদা-দুলাল সেন? জার্নালিস্ট, সাহিত্যিক, লেফ্‌টিস্ট, পেন-ইংক আর্টিস্টও বটে। থিয়েটারের দূতও

সাজে। তবে কিছু মূল্যবান কথা বলে যশোদা-দা।—আশিককো পতা কাঁহা? দিন কঁহি, রাত কঁহি। খাতা কেয়া? পিতা কেয়া?—পিতা জরুর দারু। যো মিলতা সোহি খাতা। না মিলে তো ভুখে মরে। পিয়ারী ক্যায়সা? গোরী তো গোরী, কালী তো কালী। যো নয়ী সোহি ভালি। আজ যো ভালি—কাল সো নহি; এই হল সাচ্চা মডার্ন মানুষ। পথে চলে যশোদা-দা আপন মনে কথা বলতে বলতে, নিঃশব্দে কথা বলে, হাসে, চোখ পাকায়, ভ্যাঙায়, কিন্তু আশ্চর্য, হাত ছোঁড়ে না, যে সস্তা প্যাচ নাকি সিনেমা বা থিয়েটারের নাটকে করে, একজনের নাকে ছোঁড়া হাত লাগিয়ে দিয়ে, তাকে রাগিয়ে খানিকটা কমিক করিয়ে লোক হাসায়। যশোদা দা খুব মুখ নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে আপন মনে কথা বলতে বলতে পথ চলছে—তুমি হঠাৎ সামনে এসে গেলে, দেখে আশ্চর্য হয়ে বললে—কি যশোদা দা?

সঙ্গে সঙ্গে যশোদা দা আত্মস্থ। মুহূর্তে একমুখ হেসে বলল—আরে! ছোট্ট এবং দ্রুত উচ্চারিত একটি—আরে!

—কি ব্যাপার? আপন মনে, মুখ নেড়ে নেড়ে—

—তবে আর 'আরে' বললাম কেন? মনে হল একটা প্রেতাত্মা আসছে। মন্ত্র পড়ছিলুম, তা দেখি চোখের ভুল। প্রেতাত্মা নয় দুরাত্মা। মানে তুই। শ্রীমান আনন্দ।

হঠাৎ উঠে পড়ল আনন্দ। ঘরে গিয়ে পোশাক পরতে লাগল। প্যাণ্টটা বড় ভালো কেটেছে। ক্রীম রঙের হাওয়াইটা—, না সাদা শার্ট প'রে টাই বাঁধলে আজ। মুখখানা তোয়ালে দিয়ে ভালো করে ঘষে একটু ভ্যানিসিং ক্রীম মেখে নিলে। তারপর বুরুশটা চালিয়ে সামনের চুলগুলোকে ফাঁপিয়ে দিলে। গুড্। নট্ শুধু আনন্দ, বাট্ আনন্দকুমার। অক্ষরে অক্ষরে—মানে আক্ষরিক অর্থে সত্য। নিজেকে বেশ সুন্দর লাগছে পোশাকটায়। বিপদ করেছে নাকটায়—বড্ড ধারালো। এমনি মন্দ লাগে না, কিন্তু ফটোতে নাকটা যেন জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে যায়। নিজের ছবিকেই সে বললে—নো হোপ সার। সিনেমা জগতে কুমার হয়ে নায়ক সাজবার নো হোপ্। তাতে দুঃখ করো না। ছবিতে মিছে অভিনয় ক'রে কি করবে? ছোড় দো। পথে নেমে পড়। বিংশ শতাব্দী। আজাদ হিন্দোস্তান। নয়া জিন্দিগী। সিঁথী টু চৌরিঙ্গী—এমন কি রাজভবন অ্যাসেম্বলি হাউস পর্যন্ত অবাধ গতি। চৌরিঙ্গীতে আনন্দলোক বানিয়ে খাও দাও আর যশোদা-দা বলে—'মজেমে রহো। খাও পিও, পরদেশ যাও, ঘুমো, মহব্বতি করো, হররোজ নয়া মহব্বতি, বাস্। বাস এক রোজ মর যাও।' শেষে বলে—জীবন রঙীন গ্যাস বেলুন। সুতোয় বাঁধা তে-কোণা। কেটে ভেসে পড়। ওঠ ওঠ, ভেসে বেড়াও। সুখ তাতেই! তারপর—ফট্। মানে কেটে গেল। গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশল। কট্টুকু রবার এসে পড়ল ধুলো মাটির ধরণীতে। বাস মিশে গেল।

বায়ুমণ্ডলে ভাসতে বেরিয়ে পড়ল আনন্দ—হরিয়া ফেরবা মাত্র। ব্যাঙ্ক থেকে আনা টাকার দশটা রেখে বাদবাকী সবই প্যাণ্টের পকেটে পুরলে। হঠাৎ কি মনে হল—জরদাওয়ালার ছবিটা নিলে। ও লোকটাকে দিয়ে যাবে। একটা বিজ্ঞাপন হবে—হ্যাঁ, কথার মানুষ বটে। নিজে এসে পৌঁছে দিয়ে যায়। এক ঢোক খেয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এখান থেকে বাস ধরাই এক হাঙ্গামা। রাবিশ! জীবনটাই হাঙ্গামা করে তুলেছে এরা। সমাজ গভর্নমেণ্ট—

সব—সব মিলেছে, জোট বেঁধেছে। সাধে মানুষ চেঁচায়, বলে—সব বরবাদ। সব বরবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

বাসও চলছে হরদম। ভিড়েরও অন্ত নেই। আপিস ভেঙেছে কখন। আপিসের পর সব এদিক-ওদিক সুখের সন্ধানে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে ফিরছে। বাড়িতে অভাব-অশান্তি-অনটন-অসুখ-যন্ত্রণার শেষ নেই। স্ট্যাণ্ডে লোক দাঁড়িয়ে একগাদা—সব চলছে। বাড়ির আবহাওয়া থেকে পালাচ্ছে।

সব বরবাদ।

ওদিক থেকে একখানা বাস এসে দাঁড়াল। লোক নামছে। এদিকের বাসে সে উঠে বসল। হঠাৎ নজরে পড়ল লম্বা কালো মেয়ে—হাতে বেঁটে ছাতা। বাড়ি ফিরছে। রাত্রে ছাতা মাথায় দেয় নি, নতমুখী হয়ে চলেছে।

নামবে? না। পেটের মধ্যে ঢোকুটা চন চন করছে। রাবিশ। চলো—। মনে মনে বলতে বলতেই বাসখানা ছেড়ে দিলে। ওই চলছে—লম্বা পা খাটো খাটো ক'রে ফেলে চলছে। হ্যাঁ, স্টাইল একটা আবিষ্কার করেছে বটে। রূপ না থাকলে স্টাইল ভিন্ন বাঁচে কি করে?

কালো মেয়ে তার উপর ঢ্যাঙা। চলনটা ওর স্টাইলই বটে। তবে নিজে থেকে ওটা ও আবিষ্কার এবং আয়ত্ত করে নি। ধমকে শাসনে আবিষ্কৃত হয়েছে। ধমক এবং শাসনের জন্যে আয়ত্ত হয়ে এখন ওইটেই ওর অকৃত্রিম চলনে দাঁড়িয়েছে। লম্বা পায়ে দীর্ঘপদক্ষেপে যখন ও চলত আট-দশ বছর বয়সে তখন মা ধমকাতো। একে তো রঙ কাঠকয়লা তারপর ঢ্যাঙা তালগাছ। পাগুলো সরু সরু তাতে চলছে এই পা ফেলে এই পা ফেলে। যেন হাড়গিলে কাদাখোঁচা পাখী চলছে। খাটো—পায়ের চলন খাটো! ছোট করে ফেল্। তখন ফ্রক পরত। ফ্রকে ওকে খুব খারাপ লাগতো। কিন্তু শাড়ি! পাবে কোথায়? জুটবে কি থেকে? বাপ ইস্কুল মাস্টারি করত, তাও নিচের ক্লাসের মাস্টার। মাইনে ছিল ষাট, তারপর যুদ্ধের সময় কিছু বেড়েছিল মাগ্‌গি ভাতা হিসেবে। দেশ স্বাধীন হ'তে সাড়ে বিয়েনব্বুই হয়েছিল। সংসার বড় ছিল না; এক ছেলে এক মেয়ে, মেয়েই ছোট। সুরাহার মধ্যে সিঁথিতে বাড়ি ওদের দুপুরুষের, বাড়িভাড়া লাগত না। চলে যেত কোনরকমে। মা অবিশ্যি মনসা পূজার কথার মনসার মতো বিষ ঢালত, খেতো আবার উগলাতো। শ্যামলীর ইস্কুল মাস্টার বাপ কালো মেয়ের নাম রেখেছিলো শ্যামলী। বাপকে মা বলতো—পোড়াকাঠ। বাপ মেয়ের মতোই কালো এবং লম্বা ছিল, ছেলেও তাই কিন্তু ছেলের কালো রঙ তখনও সমাজে সংসারে সমস্যা ছিল না। শ্যামলীর বাপ হেসে বলতো—দেখ আমাকে মদনমোহন বলতে বলছি না, তবে পোড়াকাঠ-শব্দটা একটু সরস করে বলতে পার না। আমারও ভাল লাগে, পাঁচজনের কাছেও তোমাকে পতিনিন্দার দোষভাগিনী হ'তে হয় না। শুকনো কাঠ তাকে শুষ্ক কাষ্ঠংও বলা যায়—আবার নীরস তরুবরও বলা যায়। কালাচাঁদ বললে তো পার। কাঠ বলতেই যদি চাও তবে তমাল তরুও বলতে পার।

মা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠত। আর একটা সম্বোধন তার ছিল—সেটা মড়ুইপোড়া।

তিনি ওই নাম দিয়ে শুরু করতেন—মড়ুইপোড়ার বাক্যি শোন। মড়ুইপোড়া কালাচাঁদ! সে কৃষ্ণের শতনাম থেকেও বড় একটা গালাগাল পর্ব।

বাপ মারা গেল হার্টফেল করে, শ্যামলী তখন ষোল বছরের। উনিশশো বাহান্ন সালে মাথায় প্রায় চার ফুট ন-দশ ইঞ্চি হয়ে উঠছে। ইস্কুলে পড়ত। ছাত্রী হিসেবে মাঝারি, তবুও দরিদ্র ইস্কুল মাস্টারের মেয়ে এবং পুরনো বাসিন্দেও বটে—তার জন্যে ইস্কুলে ফ্রিশিপ জুটেছিল। মা এই সময়টায় উঠতে বসতে তাকে ধমকে ধমকে এই চলনে অভ্যস্ত করেছিলেন। বাড়ির উঠোনে তাকে নিজের চোখের সামনে হাঁটিয়ে অভ্যাস করাতেন। তখন শাড়ি পেয়েছে। বাপ সাদা মিলের শাড়ি কিনে দিতেন। তাই পরত। বাপ মারা গেল, শ্যামলী ফেল করলে ম্যাট্রিকে; মা তাকে হেঁসেলে ঢোকালে, আর ভাইকে বললে—যেমন তেমন ক'রে যা হোক একটা পাত্তর জোটা। বিয়ে তো দিতে হবে। ভাইও ম্যাট্রিক ফেল, তবলা বাজনায় খুব ভালো হাত, তবলা বাজায় থিয়েটারে, কলকাকলী মিউজিক সেণ্টারে তবলা শেখায়, মধ্যে মধ্যে সিনেমায় লম্বা সিঁটকে মানুষের পার্ট করে। তার সময়ও ছিল না—তাগিদও ছিল না। এবং মায়ের থেকে বুদ্ধি একটু বেশি। বিয়ের চেষ্টা সে করে নি। চমৎকার কাজ একটা তাকে জুটিয়ে দিয়েছিল। কোত্থেকে কে বুদ্ধি দিয়েছিল শ্যামলী জানে না, তবে একদিন কাপড়কাচা সাবানের এক মালিক ভদ্রলোকের বাড়ি তাকে নিয়ে গিয়ে সাবান ক্যানভাসিংয়ের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল। কালো মেয়ে, ধবধবে সাদা কাপড় জামা পরে লোকের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে এবং এই সাবানের গুণ বর্ণনা করতে হবে। হাল আমলে এসব সাবানের নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে যাতে সাবান খানিকটা জলে ফেলে হাত দিয়ে নাড়া দিলেই ফেনা হয় এবং তার মধ্যে কাপড় ফেলে দিয়ে কিছু ডুবিয়ে রেখে তুলে নিংড়ে নাও, বাস হয়ে গেল। একেবারে বকের পালক হয়ে যাবে। সাবানটার নামও দিয়েছে কোম্পানি 'বলাকা'।

তিনটে সাড়ে তিনটের সময় বের হয় শ্যামলী। সতের বছর থেকে এখন চব্বিশ পার হতে চলেছে। উনিশশো ষাট সাল; আট বছরে শ্যামলী চাকরির পথে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে। একটা হ'ল, সকালে বা ভর্তি দুপুরে গৃহস্থ বাড়িতে ক্যানভাসিং-এ গেলে বিপরীত ফল হয়। সকালে কাজকর্ম—আফিস ইস্কুলের ব্যবস্থা—দুপুরে মেয়েদের খাওয়া বিশ্রাম, এর মধ্যে গেলেই তাদের মেজাজ বেগড়ায়। সাড়ে তিনটে থেকে পাঁচটা তাদের মেজাজ ভাল থাকে। ব্যাটাছেলেদের কাছে সে তার কালো চেহারা নিয়ে গেলে তারা চটে। মেয়েরা খুশিও হয় করুণাও করে। ছাতাটা সে নিজেকে আড়াল দেবার জন্যে ব্যবহার শুরু করে নি—করেছিল রোদ্দুরের জন্যে। ব্যবহার করতে করতে সে বুঝেছে এতে মাথায় রোদ লাগে না, কালো মুখ ঘামে চকচক ক'রে আরও খারাপ দেখায় না তো বটেই তা ছাড়াও পথচারীরা একটু তাকায় তার দিকে। তাকে দেখতে চেষ্টা করে এবং দু-চারজন ঔৎসুক্য-বশতঃ খানিকটা পথ পিছন পিছন কি সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। হাতে-পায়ের কালো রং সবাই দেখতে পায়, সে কালো জেনেও সঙ্গ নেয়—তার ওই চলনের স্টাইলের জন্যে। লোকে এজন্যে ব্যঙ্গও করে, কেউ—বাপরে, কেউ ছোট্ট একটি—হুঁ, কেউ মাই গড্, কেউ কিছু কেউ কিছু, যারা

একদিন দেখেছে, তারা—ওই রে! বা ওই যায়!—বলে ওঠে। তাতে প্রথম প্রথম সে আহত হ'ত, নিষ্ঠুরতম ব্যঙ্গ শুনে এক-একদিন তখন জলও আসত চোখে কিন্তু এখন আর আসে না; বরং একটু কৌতুকই অনুভব করে। বাংলা বইও সে পড়ে। পড়ে শুনে জীবনের সূক্ষ্মবোধগুলিও তার কিছু কিছু জেগেছে। সে জানে এর থেকে মর্মান্তিক লজ্জা, হয়তো অপমান কোন মেয়ের পক্ষে হতে পারে না, তবুও সে আত্মসংবরণ করতে পারে না,—ছাতা মাথায় দিয়ে—এই চলনেই হাঁটে। তবে তার চুলের রাশি দেখে তারিফ সবাই করে। চুল সে অধিকাংশ দিনই এলো রাখে। ডোনাটে খোঁপা এত বড় হয় যে তাকে আরও বিশ্রী করে তোলে। এলো খোঁপাও একটি তালের মতো হয়। মধ্যে মধ্যে একটা বেণী করে ডগার দিকটা এলিয়ে দেয়। তেল সে মাখে না, তাতে কালো রঙ চক্ চক্ করে—খারাপ দেখায়।

বাংলা 'কবি' বইটা তার খুব ভাল লাগে। তার কারণ কবির নায়িকা ঠাকুরঝি তারই মতো কালো মেয়ে। আর ভাল লাগে শরদিন্দুবাবুর একটি গল্প। তাতে ধনী বিদ্বান নায়ক ছদ্ম পরিচয়ে দুটি মেয়েকে পড়াতে এসে—সুন্দরটিকে ফেলে কালো মেয়েটিকেই পছন্দ ক'রে বিয়ে করলে। সে কালো মেয়েরও তারই মতো একরাশি চুল। সে মেয়ে নিজেকে উপেক্ষিতা ভেবে যখন টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছিল তখনই নায়ক এসে বললে—কর্তাদের মত নিয়ে এসেছি। এখন তোমার মত চাই। কিন্তু কাঁদছ কেন? আর যদিই কাঁদছ তবে চুল এলিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে কাঁদো। কারণ কবি কালিদাস বলেছেন—কাঁদতেই যদি হয় তবে চুল এলিয়ে কাঁদো।

সে চুল এলোই রাখে। কিন্তু কাঁদবার অবকাশ হয় নি হবে না। তবুও সে এটুকু ছাড়তে পারে না। মধ্যে মধ্যে কটূক্তি শুনে ভাবে—ছি। তারপর ভুলে যায়। এ সেই অতি দরিদ্রের নিয়মিত চার আনা দামের লটারীর টিকিট কাটা! কোনবারই পায় না এবং তার ভাগ্যকেও সে স্থির জানে কখনও পাবে না তবু কিনেই যায়, কিনেই যায়। লজ্জা তার রূপ, লজ্জা তার দারিদ্র্য, লজ্জা তার এইভাবে হাঁটা, লজ্জা তার বাড়ি বাড়ি গিয়ে গিন্নীদের স্তব করা, সব জড়িয়ে গোটা জীবনটাই তার লজ্জা—তার সঙ্গে এ লজ্জাটাকেও সে মাথায় করে নিয়েছে।

মধ্যে মধ্যে দুষ্ট মানুষ আসে। কুৎসিত প্রস্তাব নিয়ে। সে কিন্তু তাও মেনে নিতে পারে না। কালনাগিনীর মতো ফোঁস করে ওঠে। চোখ দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে।

কয়েক বারই এমন ঘটেছে।

নিজেকে তারপর প্রশ্ন করেছে, তাহলে এমন করে হাটে কেন? এমন ছাতা ঢেকে চলেই বা কেন। বর্ষার সময় নীলচে প্ল্যাস্টিকের বর্ষাতি আর টুপি পরে। কোম্পানি অর্ধেক দাম দিয়েছে। তার উপরেও সে ছাতা ঢাকা দেয়।

তার আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর সে পায় নি, দিতে পারে নি।

না—এও সে চায় না। আবার ওইটুকুও ছাড়তে পারবে না।

এই সব কারণে সে কখনও চৌরিঙ্গীর দিকে হাঁটে না। সন্ধ্যের পর তো নয়ই। সন্ধ্যের পর এক ঘণ্টা আর একটা কাজ করে সে। সাবান কোম্পানীর বুড়ো ম্যানেজারের বাচ্চা নাতিকে পড়াতে হয়। পনের টাকা দেন বৃদ্ধ। আটটায় সে বাড়ি ফিরে আসে।

* * * *

পথে পড়ে এই ভদ্রলোকের বাড়ি। নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে, বাগান কেটে বসতি বসেছে, পথঘাট আলো-ঝকঝকে সব বাড়ি। মাঝখানে পার্ক রেখে নতুন এইখানটা একেবারে বালিগঞ্জের মতো হয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শী পুরনো বাসিন্দেরা এখানকার জায়গা বিক্রী করে ক্রমে ক্রমে উত্তরে সরছে। তারা এখনও বাড়ি বিক্রী করে নি। বিক্রী হয়ে যেতো কিন্তু এক খুড়ো আছে, তার বাপের সহোদর, সে সন্ন্যেসী হয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে আসে, মরে নি বলে কেউ কেনে না। তার মা দিনরাতই বলে—মরেও না। আবার মধ্যে মধ্যে বলে—তা মরে নি বলেই আছে, নইলে বাদল তো বিক্রী করে দিয়ে টাকা নিয়ে স'রে পড়ত। পথে বসতে হ'ত। মেয়ের বিয়ের ভরসা আর করে না মা। বরং এই তার ভালো হয়েছে। বাদল তবলা বাজায়, রোজগারও ক'রে কিন্তু তার অনেকটাই যায় তার বাইরের টানে। নইলে ভাল। নেশা করে না, বাবুগিরিও নেই, শুধু থিয়েটারের নাচিয়ে আশার ওখানে আড্ডা তার পাকা। ভোরবেলা বাড়ি ফেরে, বারোটা পর্যন্ত থাকে, খেয়েদেয়েই বেরিয়ে যায়। বলে থিয়েটারে। কিন্তু আশার বাড়ি দিবানিদ্রা দেয় গিয়ে। সেখান থেকে থিয়েটারে। আর সিনেমার কাজে ডাক থাকলে তো কথাই নেই—দশটাতেই বেরিয়ে যায়। মাসে পঞ্চাশ টাকা দেয়, তার বেশি সে দেয় না। বললে—চুপ করেই থাকে। বেশি বললে বলে—একটা পেট একবেলা পঞ্চাশ টাকার বেশি কি লাগে বল? আর শ্যামলীর তো একটা পথ আমিই করে দিয়েছি। ও তো মাসে ক্যানভাসিংয়ে টুইশনি করে পঁচাত্তর আশী টাকা পায়!

এরপরও কথা বললে—পরের দিন থেকে আসাই বন্ধ করে। খুঁজতে যেতে হয় শ্যামলীকে। আনন্দর বাসার ধার দিয়ে পথটাই ভাল পথ, চওড়া পথ, ভদ্র পথ। এই পথেই সে যায় আসে। তাছাড়া এ পথ দিয়ে যেতেও তার ভালো লাগে। বাংলা বইয়ের সে ক্ষুধার্ত পাঠিকা, বই সে গোগ্রাসে গেলে। এ পথে ক'জন লেখক এসে বাড়ি করেছেন, বাসা নিয়েছেন। তাদের বাড়ির ধার দিয়ে যেতেও ভাল লাগে। মধ্যে মধ্যে দেখতেও পায়। কেউ বারান্দায় বসে থাকেন। কাউকে দেখা যায় জানালার মধ্যে দিয়ে। কাছে যেতে বা গিয়ে আলাপ করতে সাহস পায় না। তাদের বাড়িগুলি পার হয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে একতলা একখানি ছোট বাড়ি, সেই বাড়িতে এসেছেন এই ভদ্রলোক, তারপরই পার্ক শেষ। ওদিকে একটা বড় রাস্তা চলে গেছে এ রাস্তাটা তার সঙ্গেই মিশেছে জ্যামিতির সমকোণ সৃষ্টির ঊর্ধ্ব রেখার মতো। সে রাস্তাটা সোজা পার হলেই পুরনো কালের পাড়া শুরু। ছোট অপ্রশস্ত রাস্তা। আঁকাবাঁকা। দু পাশে পচা ড্রেন। এরই মধ্যে গিয়ে তাদের নোনাধরা পলেস্তারা খসা পুরনো বাড়ি। উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ। কাটা খোঁয়া ওঠা উঠোনে দূর্বাঘাস মুথো ঘাস। যেখানে সান আছে সেখানে শ্যাওলা। তার দু পাশে ঘর। একদিকে একখানা ছাদ-কাটা দরদালান, তার কোলে দুখানা ঘর, অন্যদিকে একখানা রান্নাঘর একটা ভাঙা চাল। অন্য একদিকে খাটা পাইখানা। অন্য একদিকে পাঁচিল।

এই নতুন একতলা বাড়িটা নাকি এক অভিনেত্রীর। তার বাড়ি হচ্ছে খবরটা দিয়েছিল

তার দাদা! সেদিন খুব আগ্রহ হয়েছিল তার। দাদার দৌলতে থিয়েটারটা দেখতে পায় মধ্যে মধ্যে। এই অভিনেত্রীর অভিনয় সে দেখেছে। নামও তার খুব। পথ দিয়ে যেতে আসতে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করত আর কত বাকী। একদিন শেষ হল। যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে কাছ থেকে দেখত। রাস্তার উপরেই বাড়ি, দেখতে অসুবিধা ছিল না। দাঁড়িয়ে দেখত কি বড় একটা জানালা। আর তার কোলে প্রায় ছোট্ট একটা ঘরের মতোই চৌকো একটি বারান্দা। বারান্দা ঘিরে গ্রিলের মতো বেড়া পড়ল। পর্দা ফেলে দিলেই ঘর। চমৎকার। দাঁড়িয়ে দেখত আর নতুন রঙের গন্ধ শুঁকত। ভারী মিষ্টি লাগে তার। তারপর বাড়ি বন্ধই রইল। দাদা বললে সুভদ্রা দেবী এখানে আসবে না বাস করতে। ভাড়া দেবে বাড়ি। হতাশ হয়েছিল। যাঃ। ইনি এলে হাজার হোক মেয়েছেলে কাছে যেতে পারত, দাদার সূত্র ধরেও আলাপ করত। একজন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আলাপ হত। নিজের জীবন তো সবটাই দৈন্য। সে তো মুছবার নয়। কোন সম্বলই তো নেই তার! শুধু মধ্যে মধ্যে মনে হয় এ আর ভাল লাগছে না! কর্পোরেশনে টিকেদারী করে তার পরিচিত একটি বন্ধু, তার জন্যে দরখাস্ত করলে হয়। কখনও ভাবে নার্স হলে হয়। কিন্তু সে হয় না। হবেও না। বড় নিরুৎসব ঠেকে জীবন। তবু এই বিখ্যাত মহিলার সঙ্গে দেখা হলে ভাল লাগত। তাঁকে ধরে অভিনয় শিখতে পারত। কালো রঙ আটকায় না পেন্টের দৌলতে। তা এলেন না তিনি। হঠাৎ একদিন দেখা গেল এই মাস দেড়েক আগে বাড়িতে লোক এসেছে। সে ছাতার আড়াল থেকেই দেখলে বারান্দাটার টবের গাছ ঝুলিয়ে দিয়েছে। ছবি টাঙানো হচ্ছে। অনেক ছবি! একজন পাজামা পাঞ্জাবী পরা উস্কোখুস্কো চুল মানুষ ছবি টাঙাচ্ছে।

তারপর শুনলে লোকটি নাকি শিল্পী। ছবি আঁকে। ছোট গেটটায় বেশ চমৎকার করে কাঠের প্লেটে লেখা আনন্দ রায়—আর্টিস্ট। নাম সে শোনেনি। শিল্পের খোঁজ সে বড় রাখে না। সামর্থ্যই বা কোথায় আর অবসরই বা কোথায়! তবে ছবি সে ভালবাসে। মাসিক পত্রে ক্যালেণ্ডারে আঁকা ছবি খুব ভাল লাগলে বাঁধিয়ে ঘরে টাঙায়। সেও সহজ ব্যাপার নয়। ফ্রেম কাচ বাঁধাই খরচ আছে। বাড়িতে মায়ের পুজোর জায়গায় ঠাকুরের ছবি আছে। অনেক ঠাকুর। সে বেছে বেছে প্রাকৃতিক দৃশ্য পেলে বাড়ির পুরনো আমলে ফ্রেমের কাচ নিয়ে পুরনো ছবি ফেলে দিয়ে নিজেই বাঁধিয়ে টাঙায়। শিল্পীদের মধ্যে নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, গোপাল ঘোষের নাম শুনেছে। অবনীন্দ্রনাথের নাম সব থেকে উঁচুতে তাও জানে। সন্ধ্যাবেলা ফার্মের ম্যানেজারের বাড়িতে তাঁর নাতিকে পড়াতে গিয়ে কাগজ পড়তে পায়। রবিবারের কাগজের সাপ্তাহিকীর পাতাগুলি বাড়ি নিয়ে এসে খুঁটিয়ে পড়ে। তারই মধ্যে এদের কথা অনেক থাকে। আনন্দ রায় নতুন। এ কালের ছবি সব সে বুঝতে পারে না। তবুও দু-চারটে ভাল লাগে রঙের জন্য। আনন্দ রায়ের জানালা প্রায় বন্ধ থাকে। বাইরের বারান্দায় ছবিগুলি সে তিনটের সময় বেরুবার পথে কয়েক দিনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে গেছে। ছবিগুলো কেমন জড়ানো জটিল, বেশ কিছুক্ষণ না দেখলে বোঝা যায় না, হেঁয়ালির মতো। কিন্তু রঙ বড় ঝকমকে। লাল নীল গাঢ় হলুদে যেন ঝলমল করে। আরও ভাল লাগে সাজানোর ব্যাপারটা। কি চমৎকার

সাজানোর ভঙ্গি। কটিই বা জিনিস। একটা উঁচু টুলে একটা এবড়ো-খেবড়ো বিচিত্র কাঠের গুঁড়ি, কিন্তু দূর থেকে মনে হয় একটা জন্তু! কাছে গেলে বুঝতে পারে কাঠের গুঁড়িতে ত্রিভুজের মতো তিনটে খোঁদড় তার দুটোতে চোখ আঁকা, একটাতে মুখ। দুটো টুলের উপর দুটি ফুলের টব। বারান্দায় ছাজার মাথায় কয়েকটা ঝোলানো টব। মাঝখানে দুখানি চেয়ার একটি ছোট্ট টেবিল। টেবিলে একটা বেশ ফাঁপা বাঁশের ফুলদানী। বাঁশই তবে মাঝখানে চমৎকার নক্সা আঁকা। বোধ হয় নিজেই এঁকেছেন। দেখে কতদিন ভেবেছে এ সব তো সস্তা জিনিস, এ দিয়ে তাদের একখানা ঘর, যেখানা নামে দাদার জন্য, আসলে পড়ে থাকে—সে ঘরখানা এমনই করে সাজানো যায় না। তাতেও মায়ের বাধা, হাঁ-হাঁ করে উঠবে। পুরনো আমলের ভাঙা খাট, তার তলায় ভাঙা কুলো, ভাঙা চ্যাঙারি, ঘুঁটের ঝুড়ি, রাজ্যের জিনিস। সে সব বস্তুগুলির প্রত্যেকটি মায়ের বুকের এক একখানি পাঁজরা! অথচ নিত্য দেখে যায় আর এমনই একটি বাসনা, গোপন বাসনা বুকের মধ্যে পুষে নিয়ে যায়, কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্য নয়; এখান থেকে রেল পুল পার হয়ে ওপারে খালের পুল পর্যন্ত যেতে যেতেই শেষ হয়ে যায়। আপনা-আপনিই ভুলে যায়। আর একটি আফসোস জাগে সেটা বন্ধ বড় জানালাটা। সেই প্রথম দিন সে আনন্দ রায়কে ছবি টাঙাতে দেখেছে তারপর আর দেখেনি। উস্কোখুস্কো রুক্ষ বড় বড় চুল, বেশ লম্বা চেহারা একটু রোগা। মুখখানা কেমন কড়া, চোখের কোণে কালি, লোকটাকে ভয়ও করে আবার মন্দও লাগে না। ভালোই লেগেছিল। ব্যাটাছেলের চেহারা ননীগোপাল হলে মানাবে কেন? আনন্দ রায়কে আর দেখেনি, এই কাল পর্যন্ত আর জানা-লাটাও খোলা দেখেনি। ওই ঘরখানাতে একটু উঁকি মেরে দেখবার ইচ্ছে ছিল। এবং আনন্দ রায়কে ভালো করে একটু দেখতে। তা হয়নি। এই কাল হয়ে গেল সে সুযোগ। ছাতা আড়াল দিয়ে চলে বটে সে কিন্তু ওর মধ্যে থেকে বাইরের দুই পাশ, সামনের সব কিছুই সে দেখে নেবার একটি সুকৌশল আবিষ্কার করে নিয়েছে সেই ঈশপের গল্পের তৃষ্ণার্ত কাক পক্ষীটির মতো। সে যেমন জল খেতে এসে একটা পাত্রের কানায় বসে দেখলে জল অনেক নিচে তার ঠোঁটের নাগালের বাইরে, তখন সে যেমন নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে পাত্রের তলায় ফেলে জলকে নাগালের মধ্যে এনেছিল তেমনি সেও তার এই বিশেষ ভঙ্গির চলনের দোলার সঙ্গে ছাতাটিকে এক-একবার এমনভাবে অল্প পিছনের দিকে চকিতের জন্য ফেলে যে আশপাশ সামনের সব কিছু দেখে নিতে পারে। কাল সে একটু দূর থেকেই প্রথমটা দেখেছিল জানালার পাল্লা বাইরের দিকে খোলা রয়েছে। মনটা কৌতূহলী এবং খুশি হয়ে উঠেছিল। এবং আরও একবার ছাতাটা পিছনে ফেলে দেখে না নিয়ে পারে নি। দ্রুত চলন আরও একটু দ্রুত করে হেঁটেছিল। তার পরের বার দেখতে পেয়েছিল আনন্দকে। সে দেখেছিল ভদ্রলোকের চোখ তার দিকেই। বুকটা একবার ধড়াস করে উঠে ঢিব ঢিব করতে শুরু করেছিল। মনে ঠিক কি হয়েছিল বলতে পারবে না, হয়তো লজ্জা, হয়তো তার কালো রোগা মুখখানাকে ভাল করে ঢাকবার জন্যেই সে ছাতাটা একটু বেশি নামিয়ে নিজেকে ঢাকতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ঘটল কাণ্ডটা। কাকটা একেবারে সামনে ছোঁ মেরে এসে পড়ল, চড়ুইটা চকিত, একটি জোরে ছোঁড়া কিছুর মতো আগেই বেরিয়ে গেছে।

আবছা দেখেছিল ঠিক নয়, মনে হয়েছিল। তার পিছনে কাকটা কালো পাখায় শব্দ তুলে আশ্চর্য একটা আঁকাবাঁকা গতিতে ছাতার কিনারা ঘেঁষে চলে গেল। চমকে উঠে স্বাভাবিক ভাবেই ছাতাটা একেবারে পিছনে ঠেলে দিয়ে নিজেকে অনাবৃত করে দিলে—মাঃ! সঙ্গে সঙ্গে শুনলে—অঃ শব্দ! ক্ষুব্ধ এবং যন্ত্রণা-কাতর একটি মোটা গলার অঃ! উঃ! এবং আঃ! যেন মিশে গেছে একসঙ্গে। সে তাকালে সেই দিকে, সেই জানালাটার দিকে। শিউরে উঠল সে! ইস্!—শিল্পী আনন্দ রায়ের চোখ থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে। কেউ বোধ হয় ঢেলা ছুঁড়েছিল কাকটার দিকে, সেটা ছুটে গিয়ে আনন্দ রায়ের চোখে লেগেছে। তাই বোধ হয় কাকটা ঢেলা এড়িয়ে এমন গোত্তা খেয়ে নিচে নেমে এঁকেবেঁকে এমনভাবে বেরিয়ে গেল। আনন্দ রায়ের চোখে রক্ত পড়তে দেখে ঢেলা লেগেছে বলে শিউরে উঠে বলে উঠেছিল—ইস্! আপনার চোখে যে রক্ত পড়ছে! ঠিক কি বলেছিল মনে নেই। কিন্তু আনন্দ রায় যখন হাতের তালুর উপরে চড়ুইটা দেখিয়ে একটু হেসে বলেছিল—একটা চড়ুই। সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। একটা পিঁপড়ে হঠাৎ কামড়ালে মানুষ চমকে উঠে সেটাকে টিপে ধরে মেরে দেয়। কেউ আগে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারপর দেখে কঠিন আক্রোশে মেঝের উপর দ'লে দেয়। লোকটি বিচিত্র। হেসে বেশ স্নেহের সঙ্গে বললে—চড়ুই। তাকে জল নিয়ে বাঁচাতে ব্যস্ত হল। সযত্নে কোথায় যেন তুলে রেখে দিলে। তার ইচ্ছে হয়েছিল—ঘরে গিয়ে চোখটা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে দেয়। কিন্তু এতটা সে পারেনি। লজ্জা পেয়েছিল। আর বলবার কথা না পেয়ে চলে গিয়েছিল। রাত্রে কাল ফিরবার সময়ও সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল খোঁজ নিয়ে যাবে—ডাক্তার দেখিয়েছেন কিনা। যা হোক—সে তার ওই 'একটা চড়ুই' কথাতেই সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু লজ্জায় পারেনি। কি ভাববেন? তা ছাড়া পাড়ার লোক, তারা তো এতেই নানান রটনা করে। নাম দিয়েছে দালাল কালী। আর তাকে নিয়ে যে সব গল্প তৈরি করে তা শুনে তার মতো ক্যানভাসার মেয়েও লজ্জা পায়।

আজ দুপুরবেলা জানালা বন্ধ ছিল। ভেবেছিল কি লোক, বেরিয়ে গেছেন এই চোখ নিয়েই! তবে ভাল নিশ্চয় আছেন অনুমান করতে হয়নি। ভাল না থাকলে বেরুলেন কি করে? হাসপাতাল-টাসপাতাল যেতে হয়নি তো? না, এতদূর হবে না। একটু দাঁড়িয়ে সে এসে কড়া নেড়েছিল। চাকরটা তো আছেই। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে যাই। বাড়িতে না থাকলে বাড়ির ভিতরটা দেখতে চাই... না। সে থাক। চাকরটা যদি বলে হুকুম নাই। তার থেকে জিজ্ঞাসা ক'রে আর দুটো খবর নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু উনি ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন এবং ভাল আছেন শুনেই পালিয়েছিল। থাক বাবা।

বাড়ি ফিরবার পথে সে আবার দাঁড়াল।

জানালাটা খোলা আছে তবে ভিতরটা অন্ধকার। এপাশের চারফুট গলিটার ভিতরের রান্নাঘরের একটা জানালা দিয়ে আলো বেরুচ্ছে। চাকরটা রয়েছে—রান্নাবান্না করছে। আনন্দ রায় নেই। চলে গেছেন বেরিয়ে। হয়তো সিনেমায় হয়তো তাদের আড্ডায় কিংবা হয়তো কোন আত্মীয়ের বাড়ি নয়তো শ্বশুরবাড়ি। কলকাতাতেই শ্বশুরবাড়ি, বউ এখন সেখানে

গেছেন। বাসায় কোন মেয়েছেলে নেই। একা থাকেন। একলা কেন থাকেন কে জানে? কেউ নেই? হতে পারে। না পারে না। কেউ নেই তো বাসা কেন? কার জন্যে বাসা? দিব্যি তো ভালো ভালো মেস আছে বোর্ডিং আছে, আজকাল হোটেল রয়েছে। সেখানে তো বিনা ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারেন। বাসায় তো ঝঞ্ঝাট আছে। রান্নাবান্না নিয়ে একটা সংসার। একটা চাকর। নিশ্চয় বাসায় থাকবার মতো কেউ আছে। ঘরখানা দেখতে পেলে ঠিক ধরতে পারত। তবে সে বেশ অনুমান করতে পারে ঘরখানায় পাশাপাশি দুটো খাট জোড়া দেওয়া আছে। নইলে ছোট হোক দুখানা ঘরের কি প্রয়োজন। ভাবতে ভাবতেই সে চলতে শুরু করেছিল।

বড় রাস্তাটা পার হয়ে গলিপথে ঢুকল। গ্যাসের বাতি ঘুচে ইলেকট্রিক হয়ে জীবনে ঐশ্বর্য বেড়েছে। কথাটা শুনতে ভাল লাগে, যখন প্রথম ইলেকট্রিক আসে তখন সবাই বলেছিল বাঁচলাম। সেও খুশি হয়েছিল। এ তো তার আমলেই হল। তখন সদ্য বাবা মারা গেছেন। কিন্তু আলো হয়ে দুঃখ আরও বেড়েছে। গ্যাসের আলো যতগুলো ছিল ততগুলো তো দেয়নি। পথ আরও অন্ধকার হয়েছে। অন্য লোকেরা অনেকে বাড়িতে ইলেকট্রিক নিয়ে সুখ পেয়েছে নিশ্চয়, সুইচ্ টিপলেই আলো, উজ্জ্বল আলো। কিন্তু তাদের মতো লোকের বাড়িতে এখনও সেই হ্যারিকেন আর চিমনী।

এঃ! কিসের পচা গন্ধ উঠছে। কোথায় ইঁদুর পচে পড়ে আছে। দুর্গন্ধ বারো মাস চব্বিশ ঘণ্টা; নর্দমাগুলোই এখানে ছেলেদের পাইখানা।

পিছন থেকে শিষ উঠেছে।

পাড়ায় কতকগুলো চাংড়া আছে। একেবারে জানোয়ার! আজ তো শুধু শিষ। অন্যদিন ছড়া বলে। গান ধরে। তাদের দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা থাকে 'ভালোবাসি গো'! প্রথম প্রথম রাগ হ'ত। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলত। একবার সে একটু দূরের বাড়ির রোয়াকে আড্ডাবাজ ছেলেদের কাছে গিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিল—এ সব আপনাদের কি ব্যবহার? লজ্জা করে না? কি ভেবেছেন, বাবা মারা গেছেন বলে আমাদের কেউ নেই? আমরা পাড়ার পুরনো বাসিন্দে। পুরনো বাসিন্দে যাঁরা এখনও আছেন আমি তাঁদের কাছে যাচ্ছি!

মা চীৎকার করত—পাড়ায় কি মানুষ আছে! সমাজ আছে!

তারা তার পিছনে হো-হো করে হেসেছিল। তখন দাঙ্গার পর বোমা ফাটানোর সময়। একদিন তাদের দরজায় বোমাও ফাটিয়েছিল কেউ। সহে যেতে হয়েছে। তবে আগের থেকে এখন অনেক কম। বোমাবাজেরা তখন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। এখনও মধ্যে মধ্যে প্রেমপত্র পায়। সে আর চঞ্চল হয় না। প্রথম পড়েই ছিঁড়তে যায়। কিন্তু হাত দুটো সক্রিয় হয় না, একটু ধরে থেকে ভাবে পুলিসের কাছে যাবে। তারপর একটু পর আর একবার পড়ে। এবার হাসি পায়। তারপর আস্তে আস্তে কোনটা ছিঁড়ে দেয় কোনটা নর্দমায় ফেলে দেয়।

বাড়ির দরজায় এসে সে কড়া নাড়লে—মা।

ভিতর থেকে মায়ের বকুনি শুরু হয়ে গেল।—তুই আবার আজ একখানা নতুন কাপড় ভেঙেছিস! কালকের কাপড়খানা বিছানার বালিশের নিচে পাট করা রয়েছে। এ তোর

কি রকম ব্যাভার। ওই তো ছিরি!—

সে হাসলে। কি উত্তর দেবে?

—আর ওসব কি বিচ্ছিরি বই পড়িস তুই? তিনটে বোন একটা ছোঁড়াকে নিয়ে সারারাত ধরে টানাটানি—মরণ। বিকেলবেলা কোমরের ব্যথায় মরি। রান্না চাপাতে পারলুম না। শুয়েই বা করি কি? তোর বালিশের নিচে বই থাকে—নিতে গিয়ে দেখি কাপড়খানা। বইটা নিয়ে পড়ে বেমায় বাঁচিনে।

—চল। ভেতরে যেতে দাও। হেসেই সে বললে।

—আগে উত্তর দে কথার।

—উত্তর? বই পড়ে বা নিত্য নতুন কাপড় পরে যদি খারাপ হতাম মা—তবে অনেক দিন আগেই হতাম। বয়স আমার চব্বিশ পার হয়ে গেল।

মা সরে দাঁড়াল।

* * * *

চারদিন পর। চারদিন জানালাটা বন্ধই ছিল। পাঁচদিনের দিন শ্যামলী দেখলে জানালাটা খোলা। যেখান থেকে প্রথম সে দেখতে পেলে সেখানেই সে আপনা-আপনি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বুকটা স্পন্দিত হয়ে উঠল।

আনন্দ রায় ফিরে এসেছে।

পুরী চলে গিয়েছিল। সেই যেদিন সে ওঁর চাকরের কাছে ওঁর খোঁজ নিয়েছিল অর্থাৎ ওঁর চোখে আঘাত লাগবার পরের দিন। উনি ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন; সেইদিন রাত্রেই উনি পুরী চলে গিয়েছিলেন।

তার পরের দিন সকালেই সে বাজারে গিয়েছিল। দাদা ফিরে আসে ভোরবেলায় আশার বাড়ি থেকে; এসেই চা দিতে হয়, চা-টা খেয়ে দাদাই বাজারে যায়। সেদিন দাদা ফেরেই নি। সে-কথা অবিশ্যি আগের দিন বলেই গিয়েছিল দাদা। আর বলে না গেলেই বা কি হ'ত!

বাজারে দেখা হয়ে গিয়েছিল আনন্দ রায়ের চাকরের সঙ্গে। দুজনেই কুমড়োর ফালি কিনছিল। চাকরটি দাঁড়িয়েছিল সামনে। ভিড় ছিল। ঠেলে ঢোকা ঠিক ভালো লাগছিল না। পিছনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, দু-তিনবার মৃদুস্বরে সামনের লোককে বলেছিল—দয়া করে একটু সরবেন? শুনছেন?

কিন্তু শোনেনি কেউ; শুনেছিল ওঁর চাকরটি, সে কথা শুনে পিছন ফিরে তাকে দেখে চিনেই চলেছিল—আপনি কুমড়ো নিবেন?

সকৃতজ্ঞ হেসে সে বলেছিল—হ্যাঁ। বড্ড ভিড়।

—আমাকে দিন। আমি কিনব।

পয়সা সে দিয়েছিল। চাকরটি শুধু কুমড়ো কিনে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, কুমড়োর ফালিটা তার থলেতে ফেলে দিয়ে বলেছিল—আর কি নিবেন? ভিড় সবখানেই।

শ্যামলীর লজ্জা হয়েছিল সামান্য বাজারের কথা বলতে। সলজ্জভাবেই বলেছিল—

সামান্য বাজার। একপো বেগুন, একপো আলু, শাক আর একপো ছোট কুচো মাছ—আর খানিক—থাক, সে আমি কিনে নিচ্ছি। তুমি বেগুন আর আলুটা কিনে দাও।

পয়সা হাতে দিতে দিতে বলেছিল—তোমার বাবু কুমড়ো খান নাকি?

—বাবু নাই আজ।

—কোথায় গেলেন? নেমন্তন্ন?

—না। কাল রাত্রে পুরী চলে গেল।

—পুরী?

—হঁ। সনঝেতে বেরিয়ে গেল, এক ঘণ্টা পর ফিরে এল ট্যাক্সিতে—বললে বিছানা বেঁধে দে, পুরী যাচ্ছি। আরও সব বন্ধুলোক গেল।

একটু হেসেছিল শ্যামলী। আর্টিস্ট লোক। রোজগার ভালই করেন, যাবেন নাই বা কেন? জিনিসগুলি কিনে এনে চাকরটি যখন দিলে—তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেই সে বলেছিল—কি উপকার যে করলে তুমি!

—কি করলাম?

—অনেক উপকার করলে। তোমার নাম কি?

—হরি। বাবু বলে হরিয়া। একটু হেসে মৃদুস্বরে বললে—মাঝে মাঝে হরিয়া রাজা।

—খুব ভালোবাসেন বাবু। না? তুমিও বাসো!

—বাবু যে খুব ভালো লোক!

—বড়লোক! ছবি এঁকে অনেক পয়সা পান। না?

—তা পায়। তবে খুব খরচ করে!

—কেন? ওঁর স্ত্রী বারণ করেন না?

—বাবু তো বিয়ে করেনি।

—বিয়ে করেননি?

—না। উ আর বিয়া করবেও নাই।

চুপ করে গিয়েছিল শ্যামলী। তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখেই হরিয়া বলেছিল—আমি যাই।

—আচ্ছা। তুমি বড় ভাল লোক।

সে হেসে চলে গিয়েছিল। অন্যমনস্কভাবে আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল শ্যামলী। হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল—সে দাঁড়িয়েই আছে। ব্যস্ত হয়ে সে মাছ কিনতে এগিয়ে গিয়েছিল।

সেইদিনই সাড়ে তিনটের সময় হরিয়াকে দেখেছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে হেসে বলেছিল—দাঁড়িয়ে আছ?

—হ্যাঁ, আপনি যাচ্ছেন?

তারপর তিনদিন আর দেখা হয়নি। বাজারেও না—বাসার বাইরের বারান্দাতেও হরি দাঁড়িয়েছিল না। আজ হঠাৎ দেখলে, আনন্দ রায়ের শোবার ঘরের জানালা খোলা। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল আপনা-আপনি।

আবার চলতে শুরু করলে। খোঁজ করে যাবে? বলবে, আশ্চর্য মানুষ আপনি! চোখের ওই কাটাকুটো নিয়েই চলে গেলেন? আর কিছু নয়, চোখ জিনিস তো! কিন্তু—?

কিন্তু কি ভাববেন, কি বলবেন?

আবার সে দাঁড়াল। ছাতাটা একটু উপরে ঠেলে দিয়ে সর্বাগ্রে পিছনের দিকে তাকালে। বেশি ভয় তার নিজের পাড়ার পরিচিত লোকদের। নেই কেউ। সামনেও না, পাশে পার্কটাতেও না। সামনে অনেক দূরে দুজনে আসছে। গ্রীষ্ম এই ক'দিনেই বেশ চড়া হয়ে উঠেছে। রাস্তার পিচ নরম হয়েছে। মাঝে মাঝে চটির তলায় কিছু যেন নরম নরম অনুভব করছে। যাবে? চলতে চলতে তার দ্রুত চলন মন্থর হয়ে এল। কিন্তু বুকটা স্পন্দিত হচ্ছে দ্রুততর গতিতে। না যাবে না, থাক! গলাটা তার যেন হঠাৎ শুকিয়ে গেছে।

* * * *

আনন্দ রায় ঘরে ইজিচেয়ারটায় শুয়েছিল। ঘরের পাল্লাহীন দেওয়াল-আলমারির বইয়ের মাথায় বসে চড়ুইটা ডাকছে চি-রি-ক। বেশ একটুক্ষণ ছেদের পর আবার চি-রি-ক। বইয়ের তাকের মাথায় পা দুটো সম্পূর্ণ ছেড়ে একেবারে বুক পেতে বসে আছে। সম্ভবতঃ ওইটেই ওদের শোওয়া। দুপুরে পাখীরাও বিশ্রাম করে। পত্রপল্লবের মধ্যে এমনি করে বসে নিস্তব্ধ ঝিমিয়ে থাকে। ইনি ঘরটাকে কিংবা আনন্দকে ভালোবেসে এখানে এসে নিরাপদ স্থানটি আবিষ্কার করে জেঁকে বসেছেন। খেয়াল ঠিক নয়, ওরা ঘরের আনাচকানাচ, দেওয়ালের ফোঁকর, ভেন্টিলেটার, পাড়াগাঁয়ে চালের ছাঁচে, এমন কি খড়ের ছাউনির মধ্যে ফোঁকর তৈরি ক'রে নিয়ে বাসা বাঁধে। ইনি ঘরের মধ্যে আলমারির তাকে বইয়ের মাথায় জায়গা বেছেচেন দেখছে আনন্দ।

পুরী থেকে ফিরে ঘরে ঢুকবার সময়ই ওর কথা মনে হয়েছিল প্রথম। চড়ুই প্রেয়সী আছেন তো। না এই ক'দিনের অদর্শনেই অধিকাংশ সময় জানালা বন্ধ দেখে সরে পড়েছেন! সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে রাস্তায় ওই পুরনো পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। কালো মেয়ে! একটু হেসে নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করছিল—প্রেমে পড়লে যে! পুরীতে এ ক'দিন সমুদ্রতীরে এ নিয়ে অনেক সরস পরিহাস-মুখর ঘণ্টা কেটেছে তাদের। আজ ও নিজেকে পরিহাস করলে না, এ সময় তাকে কোথায় পাবে?

ঘরে ঢুকে চড়ুইটার কথা জিজ্ঞেস করতে হয়নি। হরিয়া ঘরের জানালাটা খুলে দিতেই মুহূর্তের মধ্যে খোলা জানালাটার মাথায় এসে বসে তাকে অভ্যর্থনা করেছে—চি রিক। চি রিক। চি রিক। চি-চি-চি-চি!

আনন্দ বলেছিল—এই যে! এসেছে।

হরিয়া বেডিংটা খুলছিল। সে মনিবের কথায় তার দিকে তাকিয়ে মনিবের দৃষ্টি এবং চড়ুই পাখীটাকে দেখেই বলেছিল—ভারী জ্বালাচ্ছে পাখীটা। খড়-কুটো আনছে—

—খড়-কুটো আনছে?

—হ্যাঁ। ফেলে দি রোজ, আবার দেখি আবার এনেছে। ওই আলমারির বইয়ের মাথায় জড়ো করে। আজ সকালেও ফেলে দিয়েছি।

পাখীটা ছোট পাখার ফ্রর্‌র্‌ শব্দ করে গিয়ে বইয়ের মাথায় বসল। একবার ঠোঁট দিয়ে ঠোকরালে। নাচনের মতো বার কয়েক লাফিয়ে লাফিয়ে চারপাশ ঘুরে ফ্রর্‌র্‌ ক'রে বেরিয়ে গেল। আনন্দ হরিয়াকে প্রশ্ন করলে—ঘরে ঢোকে কি ক'রে? জানালা খুলে রাখিস নাকি?

—সকালে একবার খুলি, খানিকক্ষণ খুলে রাখি, আর খুলি একবার সন্ধ্যার সময়। তখন জানালা দিয়ে আসে। আর বন্ধ থাকলে কি হবে, ওই যে পিছন দিকের দেওয়ালে ভারার বাঁশের গর্তটা ইপার উপার ছুটা রইছে পলেস্তারার সময় বন্ধ করেনি—ওই ফাঁক দিয়া ঢুকছে।

ফ্রর্‌র্‌ শব্দ ক'রে চড়ুইটা ঘরে ঢুকে জানালার মাঝখানের আড়ার পাটির উপর বসলো। মুখে একটা লম্বা শুকনো ঘাস। তারপর সটান গিয়ে বসলো আলমারির মাথায়।

—ওই দেখেন—আবার আনিছে। ধ্যাৎ-ধ্যাৎ।

—থাক।

—নোঙরা করিছে।

—করুক।

পাখীটা বইয়ের তাকের মাথায় কুটোটা রেখে ঠোঁট এবং পায়ের নখ দিয়ে কারিগরী ক'রে বিছিয়ে ডেকে উঠল—চ্রি-রি-ক। চ্রি-রি-ক।

তারপর ফ্রর্‌র্‌ শব্দ তুলে উড়ে গেল। আনন্দ ইজিচেয়ারটায় বসে হেসে একটু একটু দোল খেতে লাগল। ক্যাম্বিসের ডেক চেয়ারটা একটু নতুন ধরনের, রকিং চেয়ারের মতো দোলে।

হরিয়া চলে গেল চা আনতে।

আবার পাখীটা এল, এবারও একটা শক্ত কাঠি। আবার উড়ে গেল। আবার এল ঘাস নিয়ে। আবার গেল। প্রতিবারই ডেকে কিছু বলে গেল।

হেসে আনন্দ বললে—কি বলছ? ইনকিলাব জিন্দাবাদ! না ভালোবাসি তাই তো আসি! তা এস! যখন একদিন তোমাকে নারীমুখ দেখে তুমি নারী ব'লে টিপে আছড়ে মারতে গিয়ে মারিনি, তারপর দুপুরটা জবরদস্তি ক'রে বন্ধ ঘরে আটকে রেখে কলঙ্কিনী করেছি তখন মানতে হবে তোমার ঘর বাঁধার দাবী।

পাখীটা চ্রিক-চ্রিক-চ্রিক ক'রে ডাকছিল। এবার একটু চুপ করে ওই বইয়ের মাথায় জিরিয়ে নেবার জন্যে বুক পেড়ে বসল। বসে ডাকলে চিনিক চিনিক। শান্ত অথবা ক্লান্ত ডাক। পুরীর কথা মনে পড়ে গেল।

পুরীতে একদিন সমুদ্রের ধারে চড়ুই এবং ওই কালো মেয়ে, ওর নাম দিয়েছে ও কৃষ্ণা, ওদের গল্প বলেছিল। কৃষ্ণাকে নিয়ে পরিহাস করছিল নীরদ। যশোদা দা বলেছিলেন—দেখ নীরদ তোকে গল্পের প্লট দিচ্ছি—লেখ দেখি, দেখবি ফুঁ দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবি। কিন্তু তুই কি লিখবি?

—বলুন না। নিশ্চয় লিখব মনে লাগলে।

—মনে লাগবে না।

—কি ক'রে জানলেন ?

—চীন আসবে যে গল্পে।

আনন্দ বলেছিল—বলুন আমি লিখব। নীরদ না লিখুক।

—পারবি ? তুই পেন ইঙ্কে ছবি এঁকে গল্প কর।

—আগে বলুন।

—ধর, চীনে হুকুম হয়েছে চড়ুই বরবাদ। বিলকুল মার ডালো। কেমন ? এখন একজন শিল্পীর ঘরে একটা চড়ুই এসে ঢুকেছে। অবিশ্যি আর্টিস্টের অজ্ঞাতসারেই। পাকা রাষ্ট্রভক্ত। নীরদের মতো আধা নয়। তারপর সে একদিন দেখতে পেল চড়ুইটাকে। কিন্তু মানুষ তো। রাত্রের অন্ধকারে চড়ুইটাকে মারতে গেল—কিন্তু কি হল, মারতে পারলে না। কি হল মানে—দেখতে পেল তার বাসায় দুটি ডিম। সে তখন একটা ছোট্ট খাঁচায়—চড়ুই-এর ডিমসুদ্ধ বাসা তার সঙ্গে চড়ুইটাকে পুরে দিয়ে লুকিয়ে রাখলে। খেতে দিত—জল দিত। কিন্তু ছোট্ট খাঁচাটার একটা কাঠির শলা ছিল পচা। সেটা ভেঙে সে একদিন বেরিয়ে পড়ল। বাইরে পল্টনের লোক মারবার জন্য তাড়া করতেই—ধর এয়ারগান ছুঁড়তে সেটা মিস্ করল। পাখীটা উড়ল। একেবারে তোর চড়ুইয়ের মতোই উড়ে এসে ঘরের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল। তখন সেপাইরা ঢুকল আর্টিস্টের ঘরে। খুঁজে দেখতে গিয়ে বের করলে খাঁচাটা। খাঁচায় তখন আর একটি চড়ুই নয়—তখন দুটি বাচ্চা হয়েছে। বুঝলি। তার খাঁচা এবং আর্টিস্টকে ধরে নিয়ে গেল। হুকুম হল আর্টিস্টকে—তুমি মার নিজে হাতে। সে বললে—না পারব না। হুকুম হ'ল—শূট্ হিম।

নীরদ বলেছিল—এটা কি গল্প হল ? অ্যামেরিকায় লিখে পাঠাও যশোদা দা—, ইংরাজী ভালো লেখো, ওরা লুফে নেবে এবং মোটা টাকা দেবে।

আনন্দ বলেছে—আমি লিখব বা ছবিতে গল্প বলব। তবে উইথ সাম অল্টারেশন। সেটা হল—কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প। গল্পটা বলছে বন্দী আর্টিস্ট—ছেঁড়া কাপড় পাতলুন। এ্যাঁ ? এবং শেষটা হচ্ছে—সে যখন ন বলছে—তখন হুকুম হল পাঁচ বছর হার্ড লেবার কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প।

পুরীর প্রমোদ পর্বটায় কিন্তু এতেই ছেদ পড়ে গেল হঠাৎ। মধ্যরাত্রে দুর্ঘটনার বাসর ভাঙার মতো। নীরদ ক্রুদ্ধ হয়ে আনন্দকে বললে—দেখ না তোর ওই কৃষ্ণা আর তোকে নিয়ে কেমন একখানা ঝাড়ি, দেখবি। তোদের এই পচা সমাজ—একেবারে খুলে দেব পর্দা।

সূত্র এ থেকেই।

বাদানুবাদ থেকে শেষ পর্যন্ত আনন্দ একটা ঘুঁষি মেরেছে নীরদকে। নীরদ রোগা প্যাকাটি কুঁজো।—সামান্য মদ খেলেই কাত হয়ে পড়ে এবং চেঁচায়।

পড়ে পড়েও সে কৃষ্ণাকে গাল দিচ্ছিল পেটি বুর্জোয়া ঘরের হার্লট বলে। গোড়ায় মদের নেশার ঘোরে এবং রসাধিক্যে বলে ফেলেছিল কতকগুলি লোভাতুর কুৎসিত কথা। যার মধ্যে খানকি শব্দটাও ব্যবহার করে ফেলেছিল। আনন্দ সহ্য করতে পারেনি। প্রথমে মেরেছিল এক চড়। তাতেও থামেনি নীরদ—তখন মেরেছে ঘুঁষি।

এরপরই পালা ভাঙল।

আনন্দই বললে—আমি আজই চলব যশোদা দা।

যশোদা-দাও অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—সবাই। আজই সন্ধ্যেতে, এক্সপ্রেসে না হয় প্যাসেঞ্জারে। জগন্নাথ মন্দির একবার যাবি নাকি?

আনন্দ বলেছিল—না।

আজ ভোরে এসে নেমেছে।

হরিয়া চা নিয়ে এল। আনন্দ একটু পাঁউরুটির টুকরো গুঁড়ো করে বইগুলোর মাথায় ছড়িয়ে দিলে। তারপর খেতে বসল।

চড়ুইটা ফিরে এসে পাঁউরুটি গুঁড়ো পেয়ে খেয়ে লেজ নাচাতে লাগল। অথবা ঠুকরে খেতে গেলেই ওর লেজ নাচে।

রাত্রে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ঘুম হয়নি। তবুও জানালাটা খুলেই শুয়েছিল আনন্দ। পাখীটা তখনও ঘন ঘন আসছে যাচ্ছে—নীড় নির্মাণে ব্যস্ততার ব্যগ্রতার ওর সীমা নেই। সম্ভবতঃ ডিম পাড়ার সময় খুব কাছে এসেছে। দেওয়ালের ওই ছিদ্রটা দিয়ে কুটো ঘাস মুখে নিয়ে আসার নিশ্চয় অনেক অসুবিধে।

কিন্তু গরম হাওয়ার জন্য নিজের অসুবিধে কম হয়নি। ঘুমটা ভেঙে গেল পৌনে তিনটেতেই। পাখীটাও বাসায় বুক পেড়ে শুয়ে ঘুম ভেঙে উঠছে। ডাকছে—মৃদু শান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে—চিনিক, চিনিক। অনেকক্ষণ বাদে বাদে। কালো মুগদানার মতো চোখ দুটো কখনও খুলছে আবার বন্ধ করছে। নিদ্রাজড়িমা জড়িত নয়নে চাচ্ছেন শ্রীমতী।

ঘড়ির দিকে তাকালে আনন্দ—দুটো আটচল্লিশ।

আনন্দ পাখীটাকে বললে—কি? কি বলছ? তোমার কথা তো অনেক শুনলাম। তার কথা বল কিছু। তুমিই তো দূত! সে আসছে! ভালো আছে তো? কাল এসেছিল?

চিনিক চিনিক। তারপর ভাঁজা পা সোজা করে উঠে বার দুই গা-ঝাড়া দিয়ে সরব বা সহজ চিরিক-চিরিক-চিরিক—ডাক দিয়ে সোজা টানে ফ্রর্র্ শব্দ তুলে জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

আনন্দ উঠে জানালার কাছে দাঁড়াল।

রোদে ঝাঁজ হয়ে তাপ বেড়ে আজ নিশ্চয় একশোর উপরে। দেবদারুর কচি পাতাগুলো আমলে গেছে। এই ক'দিনের মধ্যে শিমুল জাতীয় গাছগুলোর অনেক ফুল ঝ'রে গেছে, দু-চারটে শুকনো দেখতে ডালের ডগায় কচি পাতা বেরিয়েছে। রাস্তায় কেউ নেই। গরম হাওয়া মুখে লাগছে। ক'দিন পুরীর পর এখানে রোদের উত্তাপ বিশ্রী রকম ঝলসানো মনে হচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকালো সে। দুটো পঞ্চাশ। সে ফিরে এসে আবার চেয়ারে শুলো। চোখ বুঁজলো।

নাঃ। শুয়ে থাকা যায় না। ক'দিনের ছুটির পর আজ কাজের তাড়া ছেলেবেলায় ইস্কুল-টাস্কের মতো তাগিদ নিয়ে এসেছে। উঠে সে রঙ তুলি কাগজ নিয়ে বসল—উইলিয়মসের

কাজ দিতেই হবে।

চিরিক। চিরিক। চিরিক। পাখীটা আসছে যাচ্ছে।

টং—টং—টং। চিরিক। চিরিক। চিরিক। আনন্দ সকৌতুকে ঘড়িটার দিকে তাকাল। হেসে উঠল। চড়ুইটা হেরে গেছে। বাজনা শেষ হবার পর গিয়ে বসেছে ব্রাকেটে। ডাকছে—চিরিক-চিরিক-চিরিক। তাকিয়ে আছে ঘড়িটার দিকে। আর বাজছে না। বেচারা! কয়েক মুহূর্ত ব্যর্থ অপেক্ষা করে সে উড়ে গেল—চিরিক।

আবার একবার উঠল আনন্দ। নাঃ। ওই শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। নাঃ। এই তো তিনটে। সে ফিরে এসে বসল আবার। আঁকতে লাগল।

পাকস্থলীর ছবি আঁকছিল মাল্টিভিটামিনের জন্যে। সেটাকে সরিয়ে দিলে। নতুন কাগজ নিয়ে আঁকতে লাগল। মাদারস্ টনিক। একটি মেয়ের কোলে একটি ছেলে—স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। সাঁওতাল মেয়ে আঁকবে। কালো মেয়ে—মুখখানা ঠিক কি মনে পড়ছে? যা পড়ছে তাতে তো কালো কুরূপা বলে মনে হচ্ছে না। তাই আঁকবে সে। তুলির টান দিয়ে সে হঠাৎ গুনগুনিয়ে গান ধরে দিলে—'দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। কালো? তা সে যতই কালো হোক।'

হঠাৎ বাইরে সশব্দে কিছু পড়ল। চেয়ার একখানা? কে ফেললে? বারান্দার দিকের জানালাটা সে খুলে ফেললে। বাইরে এই ঝাঁজেই দেওয়াল ঘেঁষে হরিয়া ঘুমুচ্ছে। চেয়ারখানা উল্টে গেছে, আর তার পাশেই পা হাত দিয়ে চেপে ধরে শুয়ে পড়েছে কালো মেয়েটি! হাতের ছাতাটা পাশে পড়ে আছে। বেশ লেগেছে তাতে সন্দেহ নেই! জানালা খোলার শব্দ পেয়ে, মুখ তুলে আনন্দকে দেখে তার মুখ হয়ে গেছে ধরা পড়া চোরের মতো। তবু হাসতে চেষ্টা করছে।

আনন্দ ব্যস্ত হয়েই বললে—লেগেছে খুব? কোথায় লাগল?

সে অপরাধীর মতো বললে—পায়ে লেগে চেয়ারখানা উল্টে গেল।

আনন্দ বললে—হরিয়াটা একটা হ ঙ্গট। এমন সামনে চেয়ারগুলো রাখবে। এই হরিয়া! এই!

হরিয়া উঠে বসল।—অঁ।

আনন্দ ঘুরে সামনের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বললে—কোথায় লেগেছে?

—হাঁটুতে চেয়ারখানার কোণাটায় লেগে গেল। দোষ আমারই। বলে সে চেয়ারখানাকে তুলতে গেল। আনন্দ কেড়ে নিয়ে নিজে তুলে বললে—এখনও কনকন করছে?

ম্লান হেসে মেয়েটি বললে—কমে গেছে। বলে সে হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেই একটি ছোট্ট উঃ শব্দ ক'রে আবার চেপে ধরলে পা-খানা!

আনন্দ বললে—ও লোহার চেয়ারের কোণ লেগেছে হাঁটুতে! দেখুন তো বিপদ! হাঁটু জায়গাটা ভারী খারাপ। ভাঁজ তো—ছোট ছোট হাড় থাকে। ভেঙে না গিয়ে থাকলে হয়। হরিয়া, তুই চট করে গিয়ে খানিকটা বরফ নিয়ে আয় তো। আপনি ভেতরে এসে বসুন।

—থাক, এইখানেই বসছি আমি।

—না না। এখানে বসবেন কি? এই তো সামনে বসবার ঘর। এখানে কি গরম দেখেছেন।

হেসে শ্যামলী বললে—এই গরমে আমাকে রোজ বেরুতে হয়, গরমে কষ্ট হয় না আমার।

—হয়। আপনারও হয়। সহ্য করেন। আজ আমার এখানে এসে হাঁটুতে লাগালেন, আর বাইরে বসবেন সে হয় না। তা ছাড়া এখানে বরফ ঘষবেন কি টিপবেন রাস্তায় লোক জমবে। চলুন ভেতরে চলুন।

আর আপত্তি করলে না। শ্যামলী আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে পা ফেলে এসে ঘরে ঢুকল। আনন্দ বললে—ধরব?

প্রায় যেন আর্তস্বরে শ্যামলী বলে উঠল—না—না—না। দোহাই আপনার। আনন্দ ধরল না বটে কিন্তু শ্যামলী ঘরে ঢুকবামাত্র ড্রইংরুমে বেতের সোফাসেটের একখানা চেয়ার ঠেলে এগিয়ে এনে সামনে ধরে বললে—বসুন। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে আঘাতটি সামান্য হয়নি। বসুন।

শ্যামলী তা অনুভব করছিল। বিনা বাক্যেই সে চেয়ারখানায় বসতেই আনন্দ বললে—পা দুটো একটু তুলে আলগা করে রাখুন, আমি টেনে ভিতরে নিচ্ছি। এটা একেবারে দরজার সামনে।

শ্যামলী ধীরে ধীরে কেমন হয়ে যাচ্ছে। এমন সমাদর কেউ তাকে করে না। সে সামান্য ক্যানভাসার। সে একটি শ্রীহীন কালো মেয়ে। সে অর্ধশিক্ষিতা নিতান্ত সামান্য ঘরের মেয়ে। এত সমাদর তো কেউ করেনি। তরুণের দল পাড়ায় তাকে ব্যঙ্গ করে, অশ্লীল ইঙ্গিত করে, পাড়ার বাইরে ভদ্রবেশী তরুণ প্রৌঢ়রাও পিছন নেয়—ইঙ্গিত করে। তাতে সে অভ্যস্ত—এতে সে অভ্যস্ত নয়। বড় অস্বস্তিবোধ করছে সে। আবার কি যে ভালো লাগছে। ডান হাতে হাঁটুটা চেপে ধরে সে বসে রইল মাথা হেঁট করে। মাথা সে তুলতে পারছে না আনন্দর চোখে চোখ পড়বে বলে। মধ্যে মধ্যে তার কান্না পাচ্ছে।

আনন্দ একদৃষ্টে তাকিয়েছিল তার চুলের রাশির দিকে। একরাশি রুক্ষ কালো চুল। ফেঁপে ফুলে—তার অবনত দেহখানাকে ঢেকে রেখেছে। ভাল লাগছে। তার জীবনে এ এক নতুন স্বাদ। একটি মেয়েকে এমন কাছে পাওয়া নতুন নয়। কিন্তু এমনভাবে এই করুণা, এই স্নেহের সঙ্গে কাছে পাওয়া নতুন। তার মনের প্যালেটে কালো রং আর সাদা রং যেন মিশে নতুন রঙ হচ্ছে। আকাশের মতো নীল রঙ হয়ে উঠেছে। কখনও বেশি কালো পড়ে কালচে হচ্ছে। কখনও সাদা বেশি এসে তাকে চোখ জুড়ানো নীলাভ করে তুলছে। হঠাৎ একসময় সে তার মাথায় হাত দিল। চমকে উঠল শ্যামলী। আনন্দ বললে—যন্ত্রণা খুব বেশি হচ্ছে?

মাথাটা না-এর ভঙ্গিতে দুলে উঠল।

—তবে এমন করে রয়েছেন? মনে হচ্ছে যেন যন্ত্রণা হচ্ছে সেটা দেখাতে চাচ্ছেন না।

এবারে ম্লান হেসে মুখ তুললে শ্যামলী। মনোরম মিথ্যা এমন সুখের আনন্দের পরিবেশে

বোধ হয় মন জুড়িয়ে দেয়। যাতে সবটাকে আরও মধুর ক'রে তোলে। এক্ষেত্রে আনন্দের করুণাই শ্যামলীর কাছে সে মাধুরীর উৎস—মধু। সে বললে—ভাবছি আজ আর কাজে যেতে পারব না। হয়তো দু-তিন দিনই আটকে থাকতে হবে। যেখানে কাজ করি সেখানে তারা কি বলবে? ম্লান হাসিটুকু আরও একটু বিষণ্ণতায় যেন সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো মনে হল।

—পা-খানা ধরে একটু টেনে দেব? হয়তো কমে যাবে।

—না—না।

হরিয়া বরফ নিয়ে এল।—বরফ এনেছি।

আনন্দ বললে—ভেঙে নিয়ে আয়। আর তোয়ালে দে।

শ্যামলী হঠাৎ বলে উঠল—আপনার ঘরখানি এত সুন্দর করে সাজানো!

—ভাল লাগছে?

—খুব। এমন আমি দেখিনি।

—অথচ খুব সহজ! সস্তাও খুব। খরচ বেশি নয় মোটেই। রূপ উপকরণের প্রাচুর্যে নয়, তাকে পরিচ্ছন্নতায় সাজানো। এই যে আজ আপনি পাড়হীন সাদা কাপড়খানি পড়েছেন আর জরদা ব্লাউস—এতে যে আপনাকে সুন্দর লাগছে একখানা বেনারসী পরলেও তা লাগত না। আপনার নিজের তো সে রুচি রয়েছে।

শ্যামলীর মুখখানা কেমন দেখালো সে শ্যামলী জানে না, কিন্তু সারা অন্তর তার শরতের অভ্রস্র সাদা ফুলে ভরা মালতী লতার মতো হয়ে উঠল। একটা মালতী লতার গাছ তাদের বাড়িতে আছে উঠোনের কোণের গাছটাকে জড়িয়ে।

আনন্দের কিন্তু ভারী ভাল লাগলো। মেয়েটির তো আশ্চর্য একটি লুকানো শ্রী আছে। কিছুটা পুষ্টি আর কিছুটা মার্জনা প্রসাধন হলে ও সত্যিই সুন্দর মেয়ে। চোখ দুটি সরু কিন্তু টানা। ভারী সুন্দর। কিন্তু হরিণ চোখ নয়। এ চোখ নারীর! হরিণেরও নয় পুরুষেরও নয়। খানিকটা লাল রঙ—দেহে রক্ত পুষ্ট—আর খানিকটা নীলাভ সাদা রঙ।

হরিয়া একটা গামলায় বরফ ভেঙে নিয়ে এল, তোয়ালেটা চেয়ারের হাতায় নামিয়ে দিলে। আনন্দ বললে—ঘরের দরজা বন্ধ করে দে হরিয়া। আমরা বাইরে যাচ্ছি। আপনি বরফটা ওখানে ঘষুন। কেমন? দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে।

আনন্দ নিজের শোবার এবং কাজ করবার ঘরে এসে জানালার ধারে দাঁড়ালো। মনটা খুশিতে ভরে আছে। বাইরে অপরাহ্ণ নামছে। কাক শালিক পথে নেমেছে, আকাশে উড়ছে, ইলেকট্রিক তারে বসেছে। ডাকছে। চড়ুইগুলোর অজস্র কিচকিচিনিতে ভরে দিয়েছে আশ-পাশ। তিনি কই? তিনি। দুতী? নাঃ, সে ঘরে নেই। ঢং-ঢং করে চারটে বাজল। ঘরের মধ্যে পাখার শব্দ হল না, ঘড়ির কাঁচে ছোট ঠোঁটের ঠোক্কর উঠল না, ক্রিরিচ—ক্রিচ-ক্রিচ শব্দ করে কেউ ডাকল না। সে নেই। আরে আরে এই যে, তার কানের পাশ দিয়ে পাখার ফ্রররু শব্দ হল। তার সঙ্গে ক্রিরিচ। তার পিছনে আর একটা। গলার কালো

ত্রিভুজ। সেটা জানালার ধার পর্যন্ত এসে আনন্দকে দেখে গোঁত্তা খেয়ে ঘুরল। সামনের ইলেকট্রিক পোস্টের উপর বসে লেজ নাচিয়ে ডাকতে লাগল। ঘরের মধ্যে দুতী তখন আপন বাসায় গিয়ে বসে ডাকছে ক্রিচ-ক্রিচ—। ওর তাড়ায় পালিয়ে এসেছে। ওটা পুরুষ।

তার অন্তরে রঙটা কেটে দু ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে সে চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। কত এলোমেলো চিন্তা কল্পনা। সামনের রাস্তায় তখন লোক চলাচল শুরু হয়েছে। কিন্তু সে আনন্দের চোখে পড়ল না। ঘরের মধ্যে থেকে পাখীটা বেরিয়ে গেল, আবার এল, আবার গেল। সেদিকেও তার মন আকৃষ্ট হল না। খেলাটা অর্থহীন। না। অর্থ আছে একটা। এই তো জীবনের স্বরূপ! এর উপর এত নানারকম রং চড়ানোর কিছু মানে আছে? একবার মনে হয়, নেই। একবার মনে হয়, আছে। না—নেই। মানুষই চড়িয়েছে। মানুষই সেটা ধরে ফেলেছে। তার মনে সাদা কালোয় মিলে যে শূন্য আকাশের নীল অলীক রহস্যের সৃষ্টি করেছিল সেটা কেটে যাচ্ছে।

—হরি! হরি!—ওঘর থেকে মিষ্ট নারীকণ্ঠের সসঙ্কোচ ডাকে আনন্দর চিন্তা ভেঙে গেল। সে এসে ও-ঘরের ও এ-ঘরের মধ্যের দরজাটায় একটু শব্দ ক'রে বললে—ডাকছেন? ভিতরে যাব?

—হ্যাঁ! আমি এইবার যাব।

দরজাটা খুলে আনন্দ ঘরে ঢুকল। বললে—কমল ব্যথা?

দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামলী। হেসে বললে—খুব কমে গেছে। দেখছেন না, উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি! দু পা ফেলে বললে—একটু খোঁড়াতে হচ্ছে কিন্তু চলতে পারব।

—চলতে পারবেন হয়তো, কিন্তু চলবেন না।

—আপনি আমাকে আপনি বলছেন আমার কিন্তু ভারী লজ্জা করছে। আপনি বড় সব দিক দিয়ে। আপনার মতো ভালো লোক আমি দেখিনি! পরের জন্যে—কে আমি কোথাকার নগণ্য মেয়ে—তাকে যে যত্ন করলেন—

—এই দেখুন! সেদিন আমার চোখে দুফোঁটা রক্ত দেখে যে উৎকণ্ঠা আর মমতার সঙ্গে কথা বলেছিলেন—এ তার থেকে বেশি নয়।

—কি বলছেন! কি করেছিলাম আমি?

—সুযোগ পেলে হয়তো করতেন।

—তা করতাম। এবং নিজেকে ধন্য মানতাম। আপনি একজন শিল্পী। কত বড় মানুষ!

—কত বড় মানুষ! সেও মেপে ফেলেছেন?

—ফেলিনি? ও মাপ কি লুকোয়? হাতের চড়ুই পাখীটা? একটা চড়ুইয়ের ওপর এত করুণা! আমি দেখিনি শুনিনি।

হেসে আনন্দ বললে—সে আমার ঘরেই বাসা বেঁধেছে। দেওয়াল-আলমারির পাল্লা নেই, বইয়ের থাকের উপর সে খড়কুটো এনে দিব্যি গেড়ে বসেছে।

—সত্যি?

—দেখবেন ?

—না। দেখবে বললে তবে দেখব।

—আচ্ছা এস, দেখ। সে হয়তো ঘরেই রয়েছে।

চড়ুইটা ঘরে ছিল না। আনন্দ দেখালে—ওই দেখ বইয়ের মাথায় খড়কুটোর গাদা।

—তাই তো!

চড়ুইটা কুটো মুখে এনে তাদের পাশ দিয়ে পাখার শব্দ করে উড়ে গিয়ে বসল। শ্যামলী বললে—ও মা! তারপর বললে—যে সুন্দর সাজানো ঘর, আর ঘরের মালিকের যে দয়া তাতে ও লোভ সামলাতে পারেনি।

যাবার সময় আনন্দ বললে—আজ থেকে আমরা কিন্তু বন্ধু!

—বন্ধু! আবার তেমনি শ্রী ফুটে উঠল তার মুখে। আপনি বন্ধু, আমার?

—বাধা কি? আপনার খারাপ লাগে?

—না।

—তবে?

মুখখানা এবার একটু নত হয়ে পড়ল। হাসলে। ম্লান হাসি। বললে—এখানকার লোকদের আপনি জানেন না। তারা—

—লোকের কথা সবখানে সমান। এখান সেখান নেই। কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কি? ও গ্রাহ্য করলে জীবনে শুধু না পাওয়ার দুঃখই বোঝা হয়।

—তা বটে। তবে, বন্ধুত্ব হোক জমুক তারপর হবে।

—আচ্ছা,—একটু হাসলে আনন্দ, তারপর বললে—এবার আপনার নামটি বলুন।

—আমাকে আপনি নাই বললেন।

আনন্দও বললে এবার—বেশ, বন্ধুত্ব হোক আগে। আপনার—একটা নাম আমার দেওয়া আছে। মাসদেড়েকের মধ্যে যেদিন বাড়িতে থেকেছি সেইদিনই আপনাকে ছাতার মুখ ঢেকে যেতে দেখেছি। ছাতা দেখেও চিনতে পারি। চলার মধ্যেও একটা ছন্দ আছে। তার থেকেও আপনার চুলের শোভা দেখে মনে মনে তারিফ করি।

লজ্জায় আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল শ্যামলী। এমন সব কথা শোনবার ভাগ্য তার হবে এ তার কল্পনারও অতীত। সে যেন ভিতরে ভিতরে থর-থর করে কাঁপছে, স্পর্শাতুর লজ্জাবতী লতার মতো সব স্নায়ুগুলি নুয়ে পড়ছে। সে বললে—আমার নাম শ্যামলী।

আনন্দ বলতে গেল—আমি রেখেছিলাম সুকৃষ্ণা। কিন্তু বলতে গিয়েও বললে না। বললে—আমি রেখেছিলাম কাজল। ও নামটা আমার ভারী মিষ্টি লাগে।

শ্যামলী আর একটু হেসে কোন কথা না বলে চলে গেল। সত্যিই কাজল নামটি ভারী মিষ্টি।

আনন্দ দাঁড়িয়ে রইল। শ্যামলী একটু খুঁড়িয়ে চলছে। বেচারা কালো মেয়ে। আনন্দের সমস্ত অন্তরটা একটি আনন্দে ভরে উঠেছে। উল্লাস—পরিচ্ছন্ন উল্লাস। পুরীর ঘটনার পর ওর মন আজ অত্যন্ত সংযত।

সেই উল্লাসে সে এ ঘরে এল। চড়ুই দূতীকে বলবে—তোমার দৌত্যের অপমান করিনি সখী। চড়ুই নেই। বাইরে কোথায় নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ বাইরে বেড়াবার জন্যে সে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠল। আজ সে যথেষ্ট পরিমাণ পান করবে! টাকা আছে। পুরী যাওয়ার সময় চেক দিয়ে যশোদা দার কাছে টাকা নিয়েছিল। বারে যাবে।

কিন্তু হল না। বেরুবার আগেই ঝড় এল। প্রবল ঝড়। সে সেজে বেরুতে যাচ্ছিল। আকাশের অবস্থা দেখে দাঁড়াল। ঝড় তখন দূরে উঠেছে—হু-হু ক'রে আসছে। সে বসল বাইরে চেয়ারখানায়। পার্কের দেবদারু গাছের মাথাগুলো পূবমুখো হয়ে নুয়ে পড়ল। ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিদিক। হরিয়া ছুটল জানালা বন্ধ করতে। হঠাৎ আনন্দ উঠল এবং ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললে—দাঁড়া-দাঁড়া। সে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে তাকালে আলমারির দিকে। ওই যে। চড়ুইটা বুক পেড়ে নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। আলোর ছটা পেয়ে সেটা এবার ডেকে উঠল—সেই মৃদু স্বরের মিহি শব্দ—চিনিক্-চিনিক্।

আনন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বাইরে বসল। ঝড় দেখতে বসল। একটু পর বৃষ্টি এল। বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। হরিয়া বললে—বাইরে বেরুবে না?

—না। বৃষ্টির জলে ভিজে পিচের পথের উপর ওপারের রাস্তাটায় বাস কার্ চলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে। সামনের হেড লাইটগুলি জ্বলছে—নিচে ভিজে পিচের উপর তার প্রতিবিম্বও চলছে—দুটো আলো চারটে হয়েছে। পার্কের মধ্যে জমা জলে ছটা পড়ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় সে চঞ্চল হয়ে উঠে ভাবলে—বেরুব। উৎসাহ সংগ্রহের জন্যে ব্রনমুখী ফিরিঙ্গী মেয়েটা কোন বার-টেবিলে বসে সিগারেট খাচ্ছে কল্পনা করতে চেষ্টা করলে। আবছা ঝাপসা ছবি উঠে উঠে মিলিয়ে গেল। শ্যামলীকে মনে পড়তে লাগল। কল্পনা করলে শ্যামলীর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে জেটীর ওপর রেস্তোরাঁয় বসে গল্প করছে। শ্যামলীর মুখে পুষ্টির রক্তাভা, মার্জনা, প্রসাধনের শুভ্রতা। তার পরনে কি রঙের কাপড়? ফিকে জরদা ব্লাউস—গাঢ় লাল কি ফিকে নীল। না! ফিকে নীলাভ শুভ্র পাড়হীন শাড়ি, ব্লাউস গাঢ় হলদে সোনার মত নয়তো জরদা রঙের। শ্যামলীর সিঁথিতে কি—? না, সুপ্রচুর ফাঁপানো রুক্ষ চুলের মাঝখানে সাদা টোয়াইন সুতোর মত সিঁথি—সেখানে কোন দাগ নেই। বন্ধু এবং বান্ধবী। পার্কের ওপাশের রাস্তাটার বাঁকে কয়েকখানা কার বা ট্যাক্সি উত্তরমুখে ঢুকে বাঁয়ে বেঁকে পশ্চিমমুখী হচ্ছে। দুটি করে আলো, ঝকঝকে উজ্জ্বল আলো। পরের পর। পরের পর। রাস্তার জল শুকিয়েছে। তবু পিচের উপর আভা পড়ছে লম্বা হয়ে। পার্কের ভিতরে ভিজে ঘাসে জমা আলোগুলো জেগে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় মনে হ'ল—না। এ ভালো লাগছে না।—ওরে হরিয়া। তুই যা একবার, রিক্সা ট্যাক্সি যা পাস নিয়ে যা। শ্যামলী কাজল থাক, সে আনন্দ। কিন্তু উল্লাস বার ভিন্ন হয় না। বৃষ্টিতে বারের আসর জমে ভাল।

দুই

সেদিনও বৃষ্টি হয়েছিল। চার মাস পর। বর্ষার বরণ। তবে কলকাতার রাস্তা জলে ডুবে দুর্গম দুস্তর পারাবার হয়ে ওঠে নি। আকাশে কিন্তু মেঘ এসেছে সেজেগুজে। নিরিড় কালো মেঘ। আনন্দ ট্যাক্সি করেই ফিরল। রাত্রি তখন এগারটা বেজে গেছে। গাড়িটা পার্কের পুব মাথায় ঢুকে পশ্চিম দিকে ধনুকের ভিতর দিকের বাঁকের মতো রাস্তাটার মোড় নিচ্ছিল, আনন্দ বললে—নেহি সর্দারজী, ডাহিনাসে সিধা চলিয়ে।

আনন্দের কণ্ঠস্বর জড়িত। মদ খেয়েছে।

কিছুদূর উত্তরমুখে এসে বাঁয়ে পশ্চিমমুখী রাস্তা ধরে বাসায় উঠবে। মোড়টায় এসে সে বললে—রোখিয়ে তো।

—হিঁয়েই উতরেঙ্গে সাব?

নামতে গিয়ে আনন্দ অনুভব করলে পায়ে জোর কম হয়ে পড়েছে। মদ বেশি খেয়েছে। শুধু তাই নয়, মদ বেশ কিছুদিন পর খেয়েছে। কিছুদিন মদ সে খায় নি। অনেকদিন পর কতটায় ঠিক থাকতে পারবে তা ঠিক বুঝতে পারে নি। এবং মেজাজে সে ক্ষুব্ধ ছিল, নিষ্ফল ক্ষোভ। রাগ হয়েছিল নিজের উপর। শ্যামলী! শ্যামলী তাকে অপমান করেছে, তাকে ফেলে তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, নিষ্ঠুর কথা বলেছে। অপমানের এবং ব্যর্থতার ক্ষোভে সে একটা বারে ব'সে মদ খেয়েছে।

এই কয়েক মাসের মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক গতিতে তারা অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছিল। সেই যেদিন শ্যামলীর পায়ে আঘাত লাগে তার পরদিন তার অনেক কাজ ছিল, বেরুনো উচিত ছিল বারোটার মধ্যে। বেরোয় নি। চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। কালো মেয়ে কাজল—সে নাম দিয়েছে—তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বীকার করেছে। না, বন্ধুত্বের চেয়েও কিছু বেশি তার তলায় ছিল। জোড় কলমের মতো। সনাতনই বল আর আদিমই বল একটি নারী এবং একটি পুরুষের মধ্যে চোখাচোখি হলে বিদ্যুতের গতিতে যে একটি অদৃশ্য শিহরণ বয়ে যায় পরস্পরের, অঙ্গের দিকে মনের দিকে চুম্বকের লোহা আকর্ষণের মত সেই আসল গাছের মাথাটা কেটে স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা বন্ধুত্ব যে কোন একটার ডাল কেটে বাঁধা হয়। কোন ঝড়ে ওই জোড় ভেঙে জোড়া দেওয়া ডালটা যখন ভাঙে তখন আসল গাছটা ডাল মেলে গজায়। ও গাছটা অক্ষয়বটের মতো, দূর্বাঘাসের মতো। ওর মৃত্যু নেই। জীবনই ওর শেকড়। ওটা ছিল, অন্যে অস্বীকার করে করুক, আনন্দ অস্বীকার করে না। সে নতুন কালের নতুন মানুষ, সে পুরানো কালের সব সংস্কারকে কাটিয়েছে। সে ইস্কাপনকে ইস্কাপন বলে। তবে হ্যাঁ, সে মানুষ। মানুষ মানুষীকে যেকালে বলপ্রয়োগে অপহরণ করত সে কালকে অনেক পিছনে রেখে এসেছে। সে জয় করে তার মনকে আগে, মন দিতে এলে দেহ দিতে হয়। এখানে পাখী আর খাঁচা, ভ্রমরা আর সোনার কৌটো পৃথক নয়। খাঁচা খুললে কৌটো খুললেও ওরা উড়ে পালায় না। সেদিন তার করুণা সত্য, অকপট

রূপে সত্য, তাকে যে কলুষিত বলবে সে ভ্রান্ত, তাকে যত্ন করার মধ্যে তার শিক্ষা সত্য স্বভাবও সত্য। একজন পুরুষ কেউ এমন ভাবে হাঁটুতে লাগালে এমনই যত্ন করত। তবে হ্যাঁ, সে মানুষী নারী বলেই তাকে করুণা ক'রে তাকে যত্ন করে অনেক বেশি খুশি—না শব্দটা খুশি নয়—পুলকিত হয়েছিল। আগ্রহ অবশ্যই অনেক বেশি দেখিয়েছিল। তাকে ভাল লেগেছিল, কালো মেয়েটির মধ্যে সে রূপ আবিষ্কার করেছিল শিল্পীর চোখে। এবং তার রুচি পছন্দে সে রূপ ভাল লেগেছিল। তার সঙ্গে কথা বলে আরও খুশি হয়েছিল। ওর কথার মধ্যে তার প্রতি গাঢ় প্রশংসার মুগ্ধতা, তার নম্রতা, সব থেকে বেশি তার সরল মিষ্টতা, না তারও থেকে বেশি কিছু যেন—হয়তো তার নাম অনুরাগ এবং নিজের বিনীত রূপগুণের দারিদ্র্যবোধ আনন্দের আরও ভাল লেগেছিল। স্পর্শকাতর লজ্জাবতীর মতো নমনীয় ভঙ্গিগুলি। এ কার না ভাল লাগে? মেয়েটি সেদিন চলে গেল, বাড়ি ফিরে গেল; তারপর সারা বিকেল সে তার ভাবনা ভেবেছিল। তার মনে রঙের স্পর্শ লেগেছিল। কাজ না থাকলে বা কোন কাজের আগে রঙ তুলি নিয়ে সে কাগজে দাগের পর দাগ টেনে চলে, এ রঙ ও রঙ সে রঙ। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের সময় কেউ যেমন আকাশে তুলির দাগের উপর তুলির দাগ টানে, রঙ বদলায়, তেমনি ভাবেই মনের আকাশে সে নানান রঙের দাগ টেনেছিল।

মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় করেছিল আপন কল্পনার মধ্যে।

যেন সে পথে যেতে যেতে দাঁড়িয়েছে তার জানালার সামনে—কি করছেন? আজ বাইরে বেরুন নি? শরীর ভাল আছে তো? না, কাজ করছেন? ছবি আঁকছেন? কি ছবি আঁকছেন? সে বলেছে—আপনি কাল পায়ে লাগিয়ে গেলেন তাই দাঁড়িয়ে আছি, পথের দিকে চেয়ে রয়েছি, দেখছি আপনি বেরুতে পারলেন কিনা।

—তাই নাকি। না না। আমি ভাল আছি। এই তো কাজে বেরিয়েছি। একটু কন্‌কন্ করছে। কাল এখান থেকে গিয়ে আরও অনেকক্ষণ বরফ ঘষেছি। মা রেগে খুন। বললে—সেঁক দে। আমি শুনি নি। এখানে উপকার যা পেয়েছিলাম।

—দাঁড়ান না, তা হলে আমিও বের হই। একসঙ্গে যাই। আসুন না একটু বসুন, আমি তৈরি হয়ে নিই। চা-টাও খেয়ে নি। হরিয়া দরজা খুলে দে। আর চা কর।

হরিয়া দরজা খুলে দিল। সে একটু ইতস্তত করেই এল ভেতরে।

ঢুকে বললে—যে সুন্দর সাজানো ঘর আপনার। আপনিই মন টানে। আচ্ছা ছবিগুলি তো সব আপনার?

—অধিকাংশই। দু-একখানা বন্ধুবান্ধবের আছে।

—এখানা?

—ওখানা আমার।

—কি সুন্দর।

—দেখুন, সবগুলি—এঘর ওঘরে। বলুন সব থেকে কোনখানা ভাল। আমি মুখ হাত ধুয়ে পোশাক পরে নিই।

আনন্দ পোশাক বাছাই করে। বেছে বেছে সাদা সিল্কের হাফশার্ট আর গাঢ় নীলচে ডেক্রনের প্যান্ট নিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

ঘরে চড়ুই পাখী বাসায় বসে আছে, এখনও তার দিনের বিশ্রামের জড়তা ভাঙে নি। মৃদুস্বরে থেমে থেমে ডাকছে—চিনিক! চিনিক! আনন্দ তখন এমনই মগ্ন যে কৌতুকবশে সে ডাকের কোন ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে নি। বাথরুম থেকে পোশাক পালটে ফিরে দেখলে কাজল, হাঁ সেদিন সে কাজলই বলেছিল মনে মনে; কাজল তখন তার শোবার ঘরে বর্ষার ছবির দিকে তাকিয়ে আছে, একদৃষ্টে দেখছে। আনন্দ এক সময় ষড়ঋতুর ছবি এঁকেছিল দুখানা। ছবিখানা সত্যই ভালো হয়েছে। কালো একটি মেয়ে মাথায় জলের ঘড়া নিয়ে আকাশ থেকে মাটিতে নামছে। তার রাশি রাশি সুদীর্ঘ চুল, মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গীও বটে। চোখ দুটি লম্বা টানা। সম্ভবতঃ কাজল ওর সঙ্গে নিজের মিল দেখতে পেয়েছে। মিল সত্যই নেই—অথচ একটা মিল আছে!

সে হেসে বললে—কি দেখছেন! আপনার সঙ্গে মিল আছে, না?

লজ্জাবতীর মতো নম্রতার আবেশ লাগল ওর সর্বাঙ্গে, বললে—আমার সঙ্গে? আমি এমনই সুন্দর? ছবিখানি কিন্তু সত্যিই সুন্দর।

—একখানা এঁকে আপনাকে দেব। শুধু দিন দুই ঘণ্টাখানেক করে আমার সামনে সিটিং দিতে হবে।

—কি করব নিয়ে?

—ঘর সাজাবেন।

—ঘর? সে ঘর আপনি দেখেন নি।

—ঘর যেমনই হোক। সাজালেই সেজে ওঠে। আচ্ছা আমি নিজে সাজিয়ে দিয়ে আসব।

—ওরে মা! আমার জননীকে আপনি জানেন না।

হরিয়া চা দিয়ে যায়। চা বিস্কুট। অনেক অনুরোধে একখানা বিস্কুট তুলে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে খায় কাজল, তারপর বেরিয়ে যায়।

এমনি কল্পনা সে করেছিল। মিলেও গিয়েছিল। এই কল্পনার পর প্রায় কয়েক দিনের মধ্যে বাস্তবে তাই ঘটে গিয়েছিল ঠিক ঠিক। অমিল শুধু তারিখের। ঠিক পরদিন, অর্থাৎ আঘাত লাগার পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও দীর্ঘাঙ্গী সূত্রধারিণীকে দেখতে পায় নি। সেদিন ওর ইচ্ছে হয়েছিল, খোঁজ নিতে, ওপাড়ার দিকে ঘুরেও এসেছিল কিন্তু কারুর কাছে ওর বাড়ি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে নি। সঙ্কোচ যা আনন্দের প্রকৃতিতে নেই, সেটা যে সেদিন কোথা থেকে এসেছিল তা সে বুঝতে পারে নি। সেদিন সন্ধ্যাতে বেরিয়েও বারে গিয়েও মদ খায় নি। যশোদা দা প্রশ্ন করেছিলেন—কি হ'ল রে? এঁ্যা?

—কিছু না। শরীরটা ভাল নেই।

সে—মানে লেখক বন্ধু, যার সঙ্গে পুরীতে ঝগড়া হয়েছিল—নেশার মধ্যে ওর নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। লোকটাকে আদৌ পছন্দ করে না আনন্দ। সেই বন্ধুটি বলেছিল

—মন ?

উত্তর দেয় নি আনন্দ। যশোদা দা ওদের মিটমাট অবশ্য করিয়ে দিয়েছিলেন, মিটমাট করে সে কিছুক্ষণ পরই উঠে চলে এসেছিল। সেদিনও ট্যাক্সি ক'রে ফিরেছিল। এই মোড়েই গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভেবেছিল, কিসের সঙ্কোচ ? যাবে সে। কিন্তু পারে নি।

পরের দিন সে গিয়েছিল। ওর মা বিস্মিত হয়েছিল। আপনি কি করে চিনলেন শ্যামলীকে। বলেছিল—আমি ওদের আপিসের কতকগুলো সাবানের নমুনা দেখতে চেয়েছিলাম। ওরা আমার কাছে ওঁকে পাঠিয়েছিলেন। হঠাৎ চেয়ারের কোণে ধাক্কা লাগল হাঁটুতে। আমি ডাক্তার দেখাতে বলেছিলাম। পাড়াতে থাকি, আমার বাড়িতে লাগালেন—তাই খোঁজ করতে এসেছি।

শ্যামলী, না, কাজল তখন বাজার গিয়েছিল। দেখা হয় নি, ফিরে এসেছিল। বাজার যেতে ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু সেটা পারে নি। আবার কেমন সঙ্কোচ হয়েছিল। এত লোকের সামনে। বলে এসেছিল—বলবেন ওঁকে, আমি খোঁজ করে গেছি। সকালে নটাতেই সে বেরিয়েছিল। উইলিয়ামসের সাহেব খুশি হয়েছিলেন তার কাজে। তার আগের রাত্রে বার থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে প্রায় সারারাত্রি কাজ করে কাজ প্রায় শেষ করেছিল। পেমেন্ট পেয়েছিল। ফিরেছিল বেলা একটায়। স্নান করে খেয়ে উঠে সে ঘুমোয় নি। জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল। অনুমান করেছিল আজ সকালে যখন বাজারে যেতে পেরেছে তখন নিশ্চয় কাজে বেরুবে।

রৌদ্র প্রখরতর হয়ে উঠেছে। পথ জনহীন, সামনের পার্কে একদল হিন্দুস্থানী আজ পিক্‌নিক করতে এসেছে। ওপারে বাস কার লরী চলছে। গাছের পাতাগুলি ম্লান কিন্তু ঝকমক করছে রৌদ্রের ছটায়। পাখীরা স্তব্ধ। তার ঘরের মধ্যে চড়ুইটা নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে রয়েছে। চোখ দুটি বন্ধ।

সে হঠাৎ তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল—কি গো ? বলতে পার—আসবে ?

পাখীটা চমকে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠেছিল।

—চমকে উঠলে যে ? সংবাদ দাও !

পাখীটা আরও চকিত হয়ে লম্বা চিঁ-রিক শব্দ করে বেরিয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু আবার মিনিট দুই-তিনের মধ্যে ফিরে বাসায় বসেছিল। আনন্দ আর ওকে নিয়ে কৌতুক করে নি। থাক—নিরীহ কৃষ্ণের জীব। থাক।

এর কিছুক্ষণ পরেই দেখা গিয়েছিল ছোট লেডিজ ছাতা। আজ কিন্তু চলনটা ঠিক তেমন দ্রুত নয়। তারপর যা সে কল্পনা করেছিল তাই। না—যা ঘটেছিল তাই মনে পড়ছে, মনে হচ্ছে এমনি কল্পনাই করেছিল।

সেদিন একসঙ্গেই দুজনে বেরিয়েছিল। একসঙ্গে চলার শুরু। মনে পড়ছে চলার সময় দুজনেই চলে নি—আরও দুজন চলেছিল। অপরাহ্ণ বেলা, পশ্চিম মুখে চলেছিল তারা দুজনে—আর দুজন পিছনে আসছিল। কথা বলছিল কাজল, সে শুনছিল। ওই তার মায়ের

কথা থেকে শুরু ক'রে তার জীবনের সব কথা—বেদনার কথাই বেশি। তাই বলে সাধারণ মানুষ, সংসারে এত দুঃখ আমার, তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ো না, করুণার আবরণ দিয়ে ভালবাসা দাও। এইটেই সব নয়, কথার মধ্যে—অত্যন্ত সহজ সুস্থ মন কাজলের—অনেক দুঃখের কথার সঙ্গে সুখের কথাও বলেছিল দুটো একটা। ওদের ভাঙা বাড়ির ছাদে কটি টবের ফুলগাছের কথা, আর পাশের বাড়ির মালতীলতাটার কথা; যার শিকড় মালিকের বাড়িতে কিন্তু লতাটা এসে উঠেছে তাদের বাড়ির উঠানের গাছটায় এবং সব ফুলগুলিই ফোটায়, সব শোভা সব গন্ধ ঢালে তাদের বাড়িতে। বলেছিল পুরনো আমলের বাড়ি দুজনদেরই। উঠানের মাঝখানে পাঁচিল আর আমাদের বাড়িটাই পূর্বদিকে। ওরা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু লতাটা পূর্বদিকের গাছটার টান ছাড়তে পারে না।

পরের দিনই কিছু বেলফুল এনেছিল সে। ভিজে রুমালে খুব আলতো ক'রে বেঁধে কাপড়ের আঁচলে ঢেকে এনেছিল। বাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে ডেকেছিল, হরি! হরি! সেদিনও আনন্দ বাড়িতে ছিল। কিন্তু ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম ভাঙে নি। পার্কের দিকের জানালাটা বন্ধ ছিল। শ্যামলী ভেবেছিল আনন্দ বাড়ি নেই। কিন্তু ডাক শুনবামাত্র আনন্দর পাতলা হয়ে আসা ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হরিয়ার ঘুম ভাঙবার আগেই সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসবার ঘরের দরজা খুলে সামনের দরজাটা খুলে দিয়েছিল। আসুন।

মুহূর্তের মধ্যে চড়ুইটা পাখায় ফুরর্ শব্দ করে বেরিয়ে গিয়েছিল ওই দরজা দিয়েই। বেচারার বের হবার সময় হয়ে গেছে তবু জানালা খোলা পায় নি। এই ঘরের দরজা খোলার সঙ্গে আলোর ঝলকের ইসারা অনুসরণ ক'রে বেরিয়ে বাঁচল। কাজল বলেছিল—আপনার জন্যে আমার গাছের—ওমা সেই চড়ুইটা বুঝি? ঘরে বন্ধ ছিল?

হেসে দুঃসাহসী আনন্দ বলেছিল—আপনার সাড়া পেয়ে লজ্জায় ছুটে পালাল। বেচারা ধরা পড়ে গেছে। আরও বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বলে নি। বলা উচিত হবে না বলেই বলে নি। কাজল ঠিক ধরতে পারে নি ইঙ্গিতটুকু। সে নিজের অসমাপ্ত কথাটাই শেষ করেছিল। কাল আমার টবের গাছের কথা বলেছিলাম, খুব সুন্দর ফুল হয়েছে। ভোরবেলা উঠে তুলে একটা বাটিতে জল একটু দিয়ে ভিজিয়ে মা চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। মা তো একটি ফুল তুলতে দেয় না, নিজে চান করে ফুলগুলি তুলে নেয়। সব পূজাতে বলি—বেশ, দেবতাকে দিলে বেশ করলে, এখন আশীর্বাদী হিসেবেও দাও, বিছানার মাথায়—শ্রদ্ধে রেখে দি। তাও না। সন্ধ্যার সময় সব [illegible] উঠোনের এক জায়গায় একটা গর্ত মতো আছে তার মধ্যে ফেলে দেবে।

সত্যই মতিয়া বেলগুলি সুন্দর। যেমন বড় নিটোল গড়ন তেমনি রঙ তেমনি গন্ধ।

আনন্দের ইচ্ছে হয়েছিল বলে—তুমি তো মালা গাঁথার কল্পনা কর না—গাঁথো না, তাহলে মায়ের দেবতার দাবী মানতে না। গাঁথো না! কিন্তু বলে নি।

* * * *

হঠাৎ আনন্দর জীবনে যেন একটা নতুন খেলা শুরু হয়ে গেল। মেয়েটি আসে—কথা বলে, ফুল দিয়ে যায়। আনন্দ ওকে বলে—কই ছবি আঁকবার সিটিং কবে দেবেন?

মেয়েটি হাসে। বলে—খেপেছেন আপনি!

—কেন?

মেয়েটি বলে—জানি না। আমি পালালাম।

আনন্দ ওর সঙ্গ নেয়। শ্যামবাজার পর্যন্ত এক বাসে যায়, তারপর ফিরে আসে!

বেশ লাগে—খেলার মত—।

হ্যাঁ খেলাই। এ খেলা তার ভাল লেগেছিল। ভালো লেগেছিল বলেই সে সন্ধ্যায় আর বারে যাচ্ছে না। ব্রনমুখী ফিরিঙ্গিনীকে উইলিয়ামস কোম্পানির আপিসে যাবার পথে অনেক দিন দেখেছে, তার দিকে তাকিয়ে দেখেছেও, কিন্তু সে তাকে টানতে পারে নি। তার রূপ আনন্দের চোখে ঠেকে না তা নয়; নিশ্চয় ঠেকে, ভাল লাগে। একসময় তার মনের কল্পনা ছিল সে যদি জীবনে বান্ধবী পাতায় তবে এই ফিরিঙ্গী মেয়েকেই বান্ধবী করবে। ওদের মধ্যে দুটো রূপ আছে—পূর্ব পশ্চিম দুই। ওরা জীবনের খেলাকে খেলা ব'লে নিতেও জানে। সে খেলোয়াড়ী মন ওদের আছে। কিন্তু তার মধ্যেও ওদের পাওনার হিসেবটা বড়। এবং খেলাটাকে এমন হিসেবের ব্যাপার করে তোলে যে মন তৃপ্তি পায় না। এই কালো মেয়েকেও সে দিয়েছে অনেক। এই ক'মাসে অনেক জিনিস দিয়েছে। তা সে খুশি হয়ে নিয়েছে। কিন্তু টাকা সেও দেয় নি, এও চায় নি। কিন্তু খেলাও তো দুজনে হয় না। দুজনে খেলতে গেলেই চারজন হয়। দিনের বেলা তো হয়ই। রোদ পূর্বদিকে থাকলে অন্য দুজন পশ্চিমদিকে, পশ্চিমদিকে থাকলে পূর্বদিকে, দুপুরবেলা হলে পায়ের তলায় চারজন তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খেলে যায়।

মন দিয়ে দেখলে সে বড় মজার খেলা। বসে আছ দু'জনে—বেশ ব্যবধান রেখে, অথচ অন্তরে ইচ্ছে হচ্ছে আরও কাছাকাছি বসি—তখন হয়তো দেখবে ছায়া দুটো প্রায় গায়ে গায়ে মিশে গেছে। তোমার হাত এদিকে—ওর হাতও এদিকে বেশ কিছুটা দূরে—সূর্য আকাশে তেরচাভাবে আলো ফেলে হাতের উপর হাতখানি রাখিয়ে দিয়েছে—কিম্বা জড়িয়ে দিয়েছে। সে নিজে শিল্পী এবং তার মন অত্যন্ত সচেতন বলেই এ ছায়ার খেলা তার চোখে পড়েছে। শুধু তাই নয় তার মনেও ঠিক সে এইভাবে কায়া আর ছায়ার খেলা খেলে যাচ্ছিল। যুবক সে—এ যুগের যুবক—তার যৌবন অর্থ দিয়ে যৌবন ভোগের ব্যাপারে দোষ দেখে না। —সেকালেও যারা দোষ দেখত—নানা বিধি নিষেধ মুখে মানত, তারাই কাজে তাকে লঙ্ঘন করে—গোপনে আড়ালে বীভৎস ব্যভিচার করত এবং পরের দিন ভাল ভাল কথা বলত এমন কি গঙ্গাস্নান করত। তা সে নয়; তার সব প্রকাশ্য, সে ধার কিছুই ধারে না—শুধু আইনগত বাধা এড়িয়ে চলে; এই বিকিকিনির খেলা সে বেশ কিছুদিনই খেলেছে; তার জন্য গ্লানিবোধ সে করে না, নিজেকে কারুর চেয়ে খাটোও মনে করে না। কিন্তু একটা নতুন তৃষ্ণা যেন জেগেছে—এই কালো লম্বা মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়ে। টাকা দিয়ে দেহ কেনা নয়—মন কেনা। না মন কেনা নয়, মন জেতা। ভারী মিষ্টি লাগছে খেলাটা।

একটা মমতা! হ্যাঁ একটা মমতা। না—মমতাও নয়। প্রথম প্রথম উদ্দেশ্যটার মধ্যে কুটীল এবং জটিল কিছু না থাক—খুব সোজা সহজও ছিল না। একটা খেলার ইচ্ছা ছিল।

কাঙাল মেয়ের কাঙালীপনা এবং মেয়ের মধ্যে চিরন্তন কালের যে সত্য নারী—পুরুষ সাহচর্যে উত্তপ্ত হয়ে বিগলিত হয়—তার সন্ধান করবার জন্য কৌতূহল জেগেছিল। ভেবেছিল—তাকে আবিষ্কার করেই বলবে—ওগো মেয়ে তোমাকে আমি খুঁজি—মানে পুরুষ বরাবর খোঁজে—কিন্তু এই দেউলে কালো রূপের আবরণের মধ্যে তোমাকে পেতে আমার আর ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু কয়েকদিন একসঙ্গে শ্যামবাজার পর্যন্ত যাওয়ার ফলে—মনের মধ্যে আরও কিছু যেন জাগল। ভাল লাগল—মেয়েটির সারল্য। সোজা মন সহজ মন। মনটি অনুন্নত বিনীত বটে কিন্তু ঠিক যেন কাঙাল নয়। ভালো লাগার স্বরূপটা বেশ চিরে চিরে কেটে কেটে দেখলে আনন্দ। মনে হল একটা করুণা নামক বস্তু কেমন করে বর্ষার জলে-ভেজা শুকনো ডাঙা দূর্বাঘাসের মত মাথা তুলে একটু সবুজ আভা ফুটিয়েছে। মনকে সে সাবধান করেছিল। উঁহু—এ ভাল নয়। সে সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছে। এমন কি পুরীর কাণ্ডটার জন্য সে লজ্জিত এবং অনুতপ্তও হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল—অন্যায়টা তো তারই। বন্ধুই তো ঠিক ধরেছিল। রসিকতা স্বভাবটাই সোজা জিনিসকে বাঁকা করা, সুঁচালো কথা। সুচালো বাঁকা কিছু বিঁধলে টানলেই বেরিয়ে আসে না—খানিকটা চামড়ায় নিয়ে তবে ছাড়ে। এবং এর রসটা মিষ্টি নয়, নোনতা। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটেতে জ্বালা ধরায়। ওখানে পটুতার সঙ্গে—মুখ বেঁকিয়ে বাঁকা কাঁটাকে বের করে দিতে হয়। রাগ করে ও সোজা টান মেরে গেঁথে গিয়েছিল। মনে মনে সতর্ক হবার সংকল্প ক'রে পরের দিন আগেভাগেই বেরিয়ে পড়েছিল। রাত্রে ফিরেছিল একটার পর। বেশ প্রমত্ত অবস্থায়। বার থেকে বেরিয়ে—ট্যাক্সি ক'রে ঘুরেছিল। পার্ক স্ট্রীট—ফ্রি-ইস্কুল স্ট্রীট ঘুরে অনেক বাঙালিনী এবং ফিরিঙ্গিনীর দেখা পেয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ব্রণমুখীকে খুঁজে পায় নি।

সকালে ঘুমিয়েছিল আটটা পর্যন্ত।

স্নান করে মাথাটা সুস্থ করে কাজে মন দিয়েছিল। একবারও জানালার দিকে তাকায় নি। চড়ুই পাখীটার আসা যাওয়ার বিরাম ছিল না। ওঃ, কুটো মুখে করে আসা যাওয়ার বিরাম নেই! একসময় তার রাগ হল। সে কাজ করছিল—ঘরের মাঝখানে বসে, জানালাটাকে টেবিলের সামনে রেখেছিল বটে কিন্তু নিজে বসেছিল অনেকটা পিছন হয়ে। একসময় পাখীটার মুখ থেকে একটুকরো ঘাস খসে স্কেচের উপর পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে পাখীটাকে খেদিয়ে দিয়ে—বইয়ের তাকের উপর থেকে কুটো দিয়ে আধ-গড়া বাসাটাকেই ভেঙে দিয়ে এসে কাজ করতে বসেছিল। [illegible] মনে কাজ করছিল, মনটা অনেকটা একাগ্র হয়েছিল; পাখীটা আবার এসে বাসাটার অবস্থা দেখে সে যে এক কি ধরণের ডাক ডাকতে শুরু করেছিল—সে যে না শুনেছে তাকে বোঝানো যাবে না। ধরময় বার দুয়েক সেই ডেকে ডেকে উড়ে গিয়ে জানালার মাঝের পাটীটার উপর বসে—কয়েকবার ডাক উড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর আসে নি। কিছুক্ষণ পর কেমন একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা হয়েছিল আনন্দেরই। ওই একটা ক্ষুদ্র জীব—বেচারা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে এখানে তার আশ্বাসে এবং প্রশ্রয়ে বাসাটুকু করেছিল। তার উপর এই ক্রোধ—ছি-ছি-ছি। সে উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়েছিল।

কই—চড়ুইটা কই? অসংখ্য চড়ুই উড়ে বেড়াচ্ছে—পার্কের গাছে, তার জানালার সামনের দেবদারু গাছটায়। ইলেকট্রিকের তারেও কয়েকটা বসে রয়েছে। কাক শালিক উড়ছে। এ ওকে তাড়া করছে। গাছগুলোর ডালপালা পাতা বাতাসে দুলছে। অনেক উপরের আকাশে চিল উড়ছে অনেকগুলো। তার মধ্যে শকুনিও রয়েছে। নামছে ওই কোণটায়। সম্ভবতঃ কিছু মরেছে। ও দিকটায় পাতিপুকুরের পড়ো জমিগুলো। সেই গন্ধওয়ালা খালটার ধার বোধ হয়। ওইখানটায় হবে।

হঠাৎ ঘণ্টা অর্থাৎ পেটা ঘড়ি বেজে উঠল। জলের কলে ঘড়ি পেটে ঘণ্টা ঘোষণা করছে। এক দুই, তিন চার, দশ ছাড়া মিলিয়ে ঘণ্টা বাজায়। জোড়া মিলিয়েই ঘণ্টা শেষ হল। তা হলে দশটা! আটটায় তো সে উঠেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে সে। হ্যাঁ দশটা। ঘাড়টাও ব্যথা করতে শুরু করেছে। কয়েক মিনিট স্লো হয়েছে তা হলে। কিম্বা জলের কলের দু মিনিট আগে বাজিয়েছে। কলে আর মানুষে অনেক তফাৎ। মানুষ অধীর হয়, কল তা হয় না। তবে তেল না পেলে—বেগড়ায় বটে। কিন্তু তার ঘড়ি বেগড়ায় নি।

হঠাৎ সে মনে মনে চমকে উঠল।

জানালাটা বন্ধ করতে হবে। লেডিজ ছাতা দেখা যাবে এক্ষুনি। জানালাটা বন্ধ করে দিলে আনন্দ। খোলা দেখলেই লেডিজ ছাতা থমকে দাঁড়াবে। কিম্বা এসে বারান্দায় উঠবে। সে সাহস তার হয়েছে! হরিয়াকে ডাকবে।—বাবু রয়েছেন? কি করছেন? ছবি আঁকছেন বুঝি? হয়তো বলবে—একবার খবর দাও না। কি আঁকছেন দেখি! কিম্বা বলবে—ফুল এনেছিলাম—দেব!

সে হতে সে দেবে না! জীবনে বিকিকিনিটাই সার। নগদ বিকিকিনি। বিকিকিনি সবই। তবে ধার আর নগদ। ধারে দেওয়া-নেওয়ার বাঁধন পড়ে। একালে—'খাদ্য নগদ কাল ধার' এ বোর্ডটা দোকানেও বাতিল হয়ে গেছে।

আনন্দ ডাকলে—হরিয়া!

—যাই।

এসে দাঁড়াল হরিয়া। নীরবে। ওটা ওর স্বভাব।

আনন্দ বললে—শোন—ওই—এ যদি আসে না—

—কে?

—ওই যে সেই মেয়েটি রে!

হরিয়া বললে—বাজারে দেখা হ'ল যে। শুধাচ্ছিল।

—কি শুধাচ্ছিল?

—বাবু কেমন আছেন? কাল দেখলাম না! কাজে গিছলেন বুঝি?

—কি বললি?

—বললাম—হ্যাঁ!

একটু চুপ ক'রে থেকে আনন্দ জিজ্ঞাসা করলে—আর কিছু জিজ্ঞাসা করে নি?

বলছিল—কখন ফিরল বাবু? রাতে যখন ফিরলাম—তখনও তো জানালা বন্ধ ছিল!

—হুঁ। বললি তো অনেক রাতে?

—হুঁ বললাম।

—বেশ করেছিস। এখন যদি আসে-যায় সে এই সময়—বলবি—আমি বেরিয়ে গিয়েছি। বুঝলি!

—হুঁ।

চলে গেল হরিয়া। আনন্দ জানালা-বন্ধ ঘরের অন্ধকারে ঘুমের রেশ অনুভব করলে। কাল অনেক রাত্রি জেগেছে। অন্ধকার হলেই ঘুমের আমেজ আসছে। সে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললে—টেবিল ফ্যানটা মাথার গোড়ায় দে!

হরিয়া বললে—একটা টাঙানো পাখা কেন। দিব্যি ঘুরবে।

—না। ওতে মশারি খাটিয়ে খাওয়া মেলে না।

ঘুমিয়ে পড়ল সে।

হরিয়া তাকে ডেকে তুললে খাবার সময়। টেবিলে চায়ের প্লেটে খাওয়া বেল রয়েছে। একটু হাসলে সে। তারপর মনে হল—লুকোচুরি খেলছেই বা কেন সে? সোজা কেনা-বেচার কথা—বললেই তো পারে।

তাই বলবে সে! খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গেল সে। সন্ধ্যেতে সকালেই ফিরলে। একটা কোয়ার্টার পাইট কিনে নিয়েই ফিরেছিল। খেয়ে সে সামনের বারান্দায় টেবিল ফ্যানটা খুলে একটা নীলবাল্বের স্ট্যান্ডিং ল্যাম্প জ্বেলে বসে রইল। কিন্তু মেয়েটিকে তো ফিরতে দেখলে না সে। দেহেমনে সে বেশ প্রফুল্ল ছিল। ঘুমিয়ে শরীর সুস্থ হয়েছে। সারা দিনে কাজ করেছে অনেক। তারপর সন্ধ্যের সময় থেকে বসে আছে তার প্রতীক্ষায়। কিন্তু সে কই?

হঠাৎ একসময় উঠে নির্জন রাস্তাটায় পায়চারি করতে করতে কখন যে ওদের বাড়ীর দ্বার পর্যন্ত গিয়ে পড়ল—তা তার খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতেই থমকে দাঁড়াল।

যাবে নাকি ওদের বাড়ী? গিয়ে ডাকবে—শ্যামলী দেবী আছেন? কাজল বলে ডাকা চলবে না। না। মুখে মদের গন্ধ উঠছে। পাড়ার ছোঁড়ারাও ভাল নয়। ওর মাও অত্যন্ত খট্‌খোগা! ফিরে এল সে।

এসেই মনে হ'ল—আবার বেরোবে কোথায় যাবে। এ যেন কেমন সব ফাঁকা শূন্য হয়ে গেছে। জীবনটার রঙ হারিয়ে যাচ্ছে। সে ডাকলে—হরিয়া!

—যাই!

—আমি বেরুচ্ছি। এসে সে ঘরে ঢুকে স্যুট পরলে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিল সে নিজেকে। হঠাৎ আয়নার ভিতর দেখলে পিছনের দেওয়ালের আলমারিতে বইয়ের থাকের উপর চড়ুইটা বসে আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে বুকটা পেঁড়ে চোখ বুজে ঘুমুচ্ছে।

ভাল লাগল তার। যাক কৃষ্ণের জীবটি ফিরেছে। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি তার নাই কিন্তু জীবটির প্রতি করুণা আছে। হাসলে একটু।

হেঁটেই বেরিয়ে গেল। বাস ধ'রে শ্যামবাজার যাবে। সেখান থেকে ট্যাক্সি নেবে। শ্যামবাজারে এসে ট্যাক্সিতে চড়ে কিছুদূর গিয়েই বললে—ঘুরিয়ে নাও ট্যাক্সি। জরুরী কাজ ভুলে এসেছি। চল!

ঘণ্টাখানেক না যেতেই ফিরল সে :—শরীরটা যেন অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ঘরে এসে হরিয়াকে বলল—খেতে দে।

পরের দিন সে দশটা না বাজতেই বাইরের বারান্দায় বসে ছবি আঁকতে শুরু করলে। ঢং ঢং করে ঘরের ঘড়িতে দশটা বাজছে, আজ কলের ঘড়িতে এখনও বাজে নি। চড়ুই পাখীটা চিক-চিক শব্দ করছে। এরপর ঘড়ির কাচে ঠোকরাবে। বলবে, বোধ হয় থামলে কেন? আনন্দের দৃষ্টি কিন্তু সামনের দিকে। অর্থাৎ পূর্বদিকে।—ওই—ওই—লেডিজ ছাতা!

সে বসেই রইল। বুকের স্পন্দন খানিকটা বেড়ে গেল। একবার মন বললে—এ করছ কি? মনই উত্তর দিলে—কেন? যা কাল থেকে ভেবে রেখেছি তাই করব। সোজাসুজি বলব। দেখ আমি এ যুগের অতি আধুনিক। তুমি যদি অতি আধুনিকা হতে পার—তবেই আলাপের জেরটা চলুক। নইলে বল, এখানেই শেষ হোক পালা।

মনের সঙ্গে মনের কথা শেষ হতে-না-হতে ছাতা কাছে এল। ছাতাটা মধ্যে মধ্যে পিছনে হেলছে। মানে সে তাকে দেখছে। ওর নিজের মনের কথা ওইখানেই খেই হারিয়ে শেষ হয়ে গেল। চাঞ্চল্যের মধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল. যেন কথা বলবার জন্যেই উঠে দাঁড়াল।

সেও থামল। এবং হাসল। কাজলের দাঁতগুলি বড় সুগঠিত। ঝিকমিক করে ওঠে। কালো মেঘের বুকে হাল্কা বিদ্যুতের মত হাসিটা দাঁতের সারির সাদা ঝিলিক হেনে ফুটে ওঠে। সে-ই আগে বললে—খুব কাজ করছেন বুঝি?

মিথ্যে বলতে বিব্রত হ'ল আনন্দ। মিথ্যে সে বলে না। তবে বলতে কোন প্রেজুডিস তার নেই। কিন্তু অনভ্যাসে থতমত খেতে হয়। বললে—হ্যাঁ। কাজ করছিলাম। তবে খুব না।

—রাতে বুঝি খুব বেড়ান?

সে তাকালে তার মুখের দিকে। অত্যন্ত সহজ মুখ সরল দৃষ্টি।—আনন্দ বললে—হ্যাঁ, পরশু একটার পর ফিরেছি। হোটেলে গিয়েছিলাম।

কাজল এতেও হাসলে। বললে—হোটেল খুব ভাল লাগে বুঝি? আর্টিস্ট লোক তো। বিস্মিত হল আনন্দ। এ তো বিচিত্র মেয়ে। যে কথাটা বললে তাতে হোটেল যাওয়া সম্পর্কে তার তো কোন গা-ঘিন-ঘিন করা মনোভাবের পরিচয় নেই। এ দেশের অর্ধশিক্ষিতা মেয়ে···! তবে কি সে ওই মেয়েদের দলে গিয়ে পড়েছে যারা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রুটির টানে পেটের দায়ে, লোভের আকর্ষণে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যের পর গিয়ে পৌঁছয় এলপ্লানেডে?

—রাগ করলেন?

—কেন ?

—কথাটা বললাম বলে ?

—না। হাসলে আনন্দ। তারপর হঠাৎ ঝপ ক'রে জিজ্ঞাসা করে বসল—

—হোটেল দেখেছেন ? গেছেন কখনও ?

—ওই সব জায়গায় এত আলো এত জাঁকজমক, যেখানে চায়ের কাপ আট আনা সেখানে আমি কোথায় যাব ? তবে অবাক হয়ে বাইরে থেকে দেখেছি!

—যাবেন ?

—না।

—কেন ? আমি নিয়ে যাব।

—না। একটু চুপ ক'রে থেকে মেয়েটি হঠাৎ বললে—দেখুন ক্যানভাসারি কার পেটের দায়ে। জীবনে না আছে অর্থ না আছে রূপ না আছে গুণ। কোন রকমে ক'রে খাই। ক্যানভাসারি করতে গিয়ে হোটেল যাওয়া লোকেদের দেখছি। তারা তো ভালো লোক নয়! অন্তত আমার পক্ষে! একটি বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

আনন্দর কথা হারিয়ে গেল। হোটেলে যাওয়ার কথা বলার জন্যে একটু লজ্জা হল তার। মেয়েটি বললে—আমি যাই। কটা বাজল ?

হাতঘড়ি দেখে আনন্দ বললে—সাড়ে দশটা।

—বড্ড দেরি হয়ে গেল। আমি যাই।

আনন্দ কিছু বলতে পারলে না! কাজল চলে গেল। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আনন্দ ঘরে ঢুকে যত তাড়াতাড়ি পারে পোশাক বদলে বেরিয়ে পড়তে চাইলে। সে যাবে, ওকে গিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে ধরবে। বলবে—আমাকে মাপ করুন।

আনন্দর ব্যস্ততায় চড়ুই পাখীটা চঞ্চল হয়ে ফর ফর করে ঘরময় পাক খেতে লাগল। আনন্দর নজরে পড়ল আবার সকাল থেকে কুটো কুড়িয়ে এনে বইয়ের থাকের মাথায় জড়ো করে বাসা বাঁধছে। একটু হাসলে। বুঝলে কাল সে বাসাটা ভেঙে দিয়েছিল বলেই আজ পাখীটা আনন্দের ব্যস্ত হয়ে ঘোরা-ফেরা দেখে ভয় পেয়েছে। সে হেসে বললে—ভয় নেই চড়ুই সখী। ভয় নেই। বাঁধো তুমি বাসা বাঁধো।

খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে সে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে দেখলে—কাজল বাসে ব'সে আছে। বাস ছাড়ছে। হাত তুলে হাঁকলে—রোখো ভাই রোখো! এই!

বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। সে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে হাঁপাতে লাগল। ভাবছিল—কি করবে ? ফিরে যাবে ? পরের বাসে গিয়ে তো ওকে ধরতে পারবে না!

ওই বাসটা চলে যাচ্ছে। ওই দূরে—পরের স্টপে থেমেছে! পরের বাসখানা হাঁকছে—শ্যামবাজার—শ্যামবাজার

ও—কি ? পরের স্টপে কালো নেমে পড়েছে। ওই তো—ওই তো! ওই ফিরে আসছে।

বোকা মেয়ে। ও এখানে আসতে আসতে এখানাও ছেড়ে চলে যাবে! কিন্তু ও বুঝতে পেরেছে যে আনন্দ তার জন্যেই ছুটে এসেছে। ও নেমে পড়েছে।

একখানা রিক্সা ডেকে সে চড়ে বসল—চল্। যা নিবি দেব। পথে ওই ও দাঁড়িয়েছে, রিক্সায় আনন্দ আসছে—তা দেখেছে কাজল। পথে রিক্সা থামিয়ে আনন্দ বললে—উঠুন।

সে স্বচ্ছন্দে উঠে বসল। বললে—কই বললেন না তো যে আপনি বেরুবেন!

আনন্দ বললে—না। কিন্তু আপনি আসবার পরই আমার মনে হ'ল—আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাওয়া উচিত।

বিস্মিত হয়ে সে বললে—কেন? আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন? কিছু তো হয় নি।

—হয়েছে। আপনাকে হোটেলে যেতে বলি নি? আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

কাজল চুপ ক'রে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললে—দেখুন পাড়ার খারাপ ছেলেরা থেকে পথে আপিসে দোকানে নানান জনেই নিত্যই এমন কথা ইসারায় বলে—স্পষ্টও বলে। শোনাটা সয়ে গেছে। তবে আপনার কথাটা তো সে ভাবে আমি নিই নি। হোটেল দেখাতে চেয়েছেন, তার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকি, ওখানকার খাবারের কত নামডাক—গরীব মেয়ে যাই নি—খাওয়াতে চেয়েছেন। এইভাবেই নিয়েছিলাম। সাধারণ মানুষ তো নন আপনি! সে আমি ওই ছোট ঘটনাটি থেকেই বুঝেছি। ওই চড়ুইটার প্রতি যে মমতা দেখেছি! একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—নইলে এমন সাহস করে আপনার সঙ্গে মিশতে পারি? ভাবি কি জানেন—ভাবি—সামান্য একটা চড়ুইকে যে এমন ভালবাসে—সে আমার মত মেয়ে কাল মূর্খ হলেও—মানুষ ভেবে নিশ্চয় ভালবাসবে।

চড়ুই পাখীটার প্রতি আনন্দ মনে মনে কৃতজ্ঞ হল। পরক্ষণেই সত্যটা মনে পড়ল। বললে—যদি বলি—চড়ুই পাখীটা সেদিন আপনার জন্যেই বেঁচেছে!

—তার মানে?

—তার মানে, যেমন ওটা এসে ঝপ করে চোখের উপর পড়ে নখ দিয়ে চোখের কোণ বিঁধে ধরলে—অমনি ওকে নিষ্ঠুর আক্রোশেই ধরেছিলাম হাতের মুঠোতে চেপে। টিপে ওটাকে পিষে আছাড় মেরেই ফেলতাম কিন্তু সেই মুহূর্তেই আপনি বলে উঠলেন—আঃ—এ যে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে! কথাগুলো ঠিক মনে নেই কিন্তু এমন মিষ্টি মমতার সুর শুনে আপনার মুখের দিকে তাকালাম—দেখলাম সেখানেও কত মায়া কত উৎকণ্ঠা। আমি আর পাখীটাকে মারতে পারলাম না। দেখলাম আমার হাতের চাপেই মর-মর হয়েছে। তখন ওকে বাঁচাতে ইচ্ছে হল।

শ্যামলী চুপ করে রইল। একটু পর বললে—না-না। আপনার মনেই ওসব ছিল। আমি না ডাকলেও, না এসে পড়লেও—এই-ই করতেন! প্রথম আঘাতের ঝোঁকে আক্রোশ হয়, রাগ হয়। কিন্তু যার মায়ামমতা আছে, হৃদয় আছে তার সে সব পরমুহূর্তেই জেগে ওঠে। নইলে আমার মত সামান্য কালো একটা গরীব ক্যানভাসার মেয়ের স্নেহ ভালবাসার দাম আপনার কাছে কতটুকু?

—অনেকটুকু! আপনি জানেন না। বলে আনন্দ সামনের দিকে চেয়ে রইল। ওর বিচিত্র মন। মন মনের সঙ্গে কথা কয় এক-একজন মানুষের। আনন্দের মন—সেই মানুষের মন। মন বললে, সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছে। মনই ধমক দিলে—কথা বলো না থাম।

কোন মেয়ের সঙ্গে কথা ব'লে এমন আনন্দ তো হয় নি কোন দিন। এ কথা কাটাকাটির বাণ-যুদ্ধ নয়, তলোয়ার খেলা নয়; এতে হার-জিতের খেলাই নেই। এ মেয়ে তা খেলে না বলেই—মনকে অভিভূত করে গভীরে কি যেন স্পর্শ করে; সেটা হৃদয় হলে হৃদয়। হৃদয় স্পর্শ করা আর কুথার মারপ্যাচে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ানো আলাদা ব্যাপার।

রিক্সায় ওরা দুজনেই চুপ হয়ে বসেছিল। সাড়ে দশটা বেজে গেছে। বাস্, ট্রাক, মোটর, গরুর গাড়ী, ঠেলার ভিড়ে রাস্তা প্রায় জাম হয়ে গেছে! ওদের কিন্তু কেউ দেখছে না; একটি ছেলে একটি মেয়ে রিক্সায় চলেছে—এ একটা সাধারণ ব্যাপার!

হঠাৎ ওরা সচেতন হল। একটা মোষের গাড়ীর সঙ্গে একটা মোটরকারের ধাক্কা লেগেছে। বিশেষ কিছু নয়, জখম কেউ হয় নি, মোটরকারটাই মোষের গাড়ীর লিগের সঙ্গে দরজার ঘেঁষ লাগিয়ে জখম হয়েছে। শ্যামলী বলে উঠল—যাক—কারুর লাগে নি।

আনন্দ কথা বললে না।

শ্যামলী আবার বললে—নতুন মোটর, দরজাটা কি হল দেখুন! এঃ!

আনন্দ এবারও কথা বললে না।

শ্যামলী বললে—কি ভাবছেন বলুন তো!

আনন্দ ফিরে তাকালে ওর দিকে। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে রইল। শ্যামলী লজ্জা পেলে। আনন্দ বললে—আজ থেকে আমরা বন্ধু, কেমন?

—বন্ধু? আমি আপনার বন্ধু?

—হ্যাঁ আরও একদিন বোধ হয় বলেছি। আজ পাকা হয়ে গেল।

শ্যামলী হঠাৎ চোখ বুজল! একটা আবেগ ওকে বিচলিত করে তুলেছে! আনন্দ ওর হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললে—আজ থেকে আমরা আপনি নই। তুমি।

ঘাড় নাড়লে শ্যামলী—না। আনন্দ বললে—আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

এবার শ্যামলী বলল—বা—আপনাকে আমি তুমি বলতে পারব না।

—পারবে। আজ না পার কাল পারবে।

—জানি না।

—আমি তোমাকে তুমি বলব।

শ্যামলী হাসলে—সে হাসি অত্যন্ত মিষ্টি—বললে—খুব ভালো লাগবে আমার।

আরও কতকটা দূর ওরা পরস্পরে [illegible] হাত রেখে চুপচাপ চলল। তারপর আনন্দ বললে—তুমি আরও পড়—কাজল। তোমাকে কাজল বলব, কেমন?

সলজ্জ হেসে ঘাড় নেড়ে কাজল জানালে—হ্যাঁ, তাই বলো! তারপর বললে—পড়ব? কি করে পড়ব? পড়তে খরচ কোথায় পাব? খাবই বা কি?

—ব্যবস্থা আমি করব।

—না! টাকা নিতে আমি পারব না।

—আমি তোমাকে একটা ভাল চাকরি দেখে দেব!

—ভাল চাকরি?

—হ্যাঁ।

—সে খুব ভাল হবে। কাজলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল! রিক্সা তখন শ্যামবাজারে এসে পড়েছে।

পরের দিন—কাজল আবার অনেকগুলি ফুল মতিয়া বেলা ওকে এনে দিল! নিজেই প্লেটে সাজিয়ে—আনন্দের কাজের টেবিলের পাশে একটি টি-পয়ের উপর রেখে দিলে! আনন্দ হাসলে! আনন্দের হাসি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবাধ্য মন মনে মনে বললে—মালা গেঁথে আনতে পারলে না?

ঘড়িতে দশটা বাজতে শুরু করল! চড়ুই পাখীটা এসে ব্রাকেটে বসে লেজ নাড়িয়ে চিরিক-চিরিক শব্দে ডাকতে লাগল!

কাজল বললে—আরে এটা তো বেশ!

আনন্দর আর কথাটা বলা হল না! সেও হেসে বলল—হ্যাঁ—ও বেশ!

* * *

ওই কথাটা মালার কথাটা বললে আনন্দ সেদিন! বন্ধুত্ব পাতানোর অনেক দিন পর। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে।

কাজল বললে ওর বাড়ীর ফুলের কথা।

আনন্দ বললে—মালার কথা। বললে—ফুল হল ঝ'রে গেল। আমার টেবিলে সাজিয়ে দিলে শোভা হয়েই রইল। মালা গাঁথতে তো পারলে না!

কাজল সলজ্জ ভাবে হেসে বলেছিল, বক্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—বেশ গাঁথব। পরবে তো?

—পরালে নিশ্চয় পারব। বান্ধবীর মালা পরব না! কিন্তু বরমাল্য করতে চেয়ো না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিল—বেশ তাই—তাতেই যদি খুশী হও তবে তাই হবে!

কালকের কথা। এর মধ্যে কিন্তু বেশ কিছুদিন চলে গেছে। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পার হয়ে গেল। চার-পাঁচ মাস চলে গেল। এর মধ্যে ঘটেছে অনেক কিছু ছোটখাটো, বড় একটা ঘটেছে। ক্যানভাসারি ছেড়ে দিয়ে কাজল, উইলিয়াম কোম্পানীর আপিসে কাজল রেকর্ড কীপারের চাকরি করছে। সেখানে রেকর্ডরুমে বসে থাকে—আর বই পড়ে। ডাক পড়লে ফাইল খুঁজে হাতে নিয়ে উঠে যায় হাসিমুখে। ঠোঁটে ওকে লিপস্টিক মাখতে হয়। চুল ওর সম্পদ। তার কায়দা ওর পুরাতন। ভাল শাড়ী জামা পরতে হয়। ইংরাজীটাও দুরস্ত হয়েছে।

কাজটা করে দিয়েছে আনন্দই।

উইলিয়ামস্ কোম্পানির সাহেব আনন্দের প্রকৃতির জন্যে এবং তার কাজের জন্যে তাকে ভালবাসে। সাহেবকে আনন্দ বলেছিল।—একটি মেয়েকে একটি কাজ দিতে পার সাহেব?

জু সাহেব দিলদরিয়া মেজাজের লোক। সে রসিকতা করেছিল। বলেছিল—তোমার তো কেউ নেই। কার জন্যে কাজ চাচ্ছ?

—ক্রেণ্ডও কি থাকবে না সাহেব!

—গার্ল ফ্রেণ্ড ?

—যদি বলি হ্যাঁ !

—তাহলে দেব। নিশ্চয় দেব। কি কাজ করতে পারবে ?

—বড় কাজ পারবে না সাহেব। ম্যাট্রিক ফেল।

সাহেব তাকে রেকর্ড ডিপার্টমেণ্টে কাজ দিয়েছিল বুড়ো রেকর্ড-কীপারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসেবে। মাইনে সব নিয়ে একশো দশ টাকা।

শ্যামলী অবশ্য ইণ্টারভ্যুতে সাহেবকে খুশি করেছিল। সাহেব বলেছিল আনন্দকে—ভেরী সার্প, ইণ্টেলিজেণ্ট, তার থেকেও বেশি রয়—চার্মিং বিহেভিয়ার। শী ইজ এ গুড গার্ল। যা ভেবেছিলাম তা নয়। তুমি ওকে বিয়ে করবে ?

—না—না সাহেব। সে সব নয়।

শ্যামলী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে অনেক। তাতে তার ত্রুটি হয় নি। তার জন্যে কৃতজ্ঞতা সে কোনদিন চায় নি, কোন মূল্যও কামনা করে নি। শুধু ভাল লেগেছে তাই সে করেছে। তার বেশি কিছু নয়।

* * * *

এর পর থেকে দুজনের বন্ধুত্ব বল বন্ধুত্ব—প্রীতি বল প্রীতি, প্রেম বলতে আনন্দের আপত্তি আছে। ফুলের মালা যাতে বরমালা না হয় সেদিকে ও সতত জাগ্রত। মেয়েটির উপকার করতে ওর ভাল লেগেছে। হয়তো করুণা। কিম্বা মমতা। তা ছাড়া ওকে যেন ও নতুন করে গড়ছে। একটি অর্ধসমাপ্ত মূর্তিকে ও যেন ঘষে মেজে রঙ দিয়ে পরিপূর্ণ করে তুলছে। খেলাই সে শুরু করেছিল—খেলা এখনও খেলাই আছে কিন্তু খেলার রকমটা পাল্টেছে। আনন্দই ওকে সাজতে শিখিয়েছে, রুচি শিখিয়েছে। কিছু কিছু পোশাকও উপহার দিয়েছে। কিন্তু শ্যামলীর নিজেরও গুণ আছে, সামান্য পোশাককে রুচির সঙ্গে প'রে দুইয়ে মিলে, অসামান্যা নিশ্চয় নয়, তবে বেশ সুশোভনা হতে পারে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে যে ইংরেজীটুকু শ্যামলী—না—কাজল শিখেছিল—এবং যা ও ক্যানভাসারী ও টিউশনি করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিল—সেটুকুও আনন্দই আবার সাহায্য করে রপ্ত করে দিয়েছে। জানাজানিও হয়ে গেছে পাড়ায় এবং মায়ের কাছে। পাড়ার কথা ছেলেরা ওর সাজসজ্জার এমন সুচারু ভোল বদলের জন্যে এবং লিপস্টিকের জন্য বলে মেমসাহেব। তবে সাহেব কোম্পানীর চাকরি, এটা ওকে একটা ইজ্জত দিয়েছে।

আনন্দ মধ্যে মধ্যে ওদের বাড়ীও যায়। শ্যামলী না—কাজল—সকালে আপিস যাবার সময় নিত্যই যায় আনন্দের কাছে।

পাড়ায় জানে আনন্দ ওর উপরওয়ালা। সাহেব কোম্পানীর বাঁধা আর্টিস্ট আনন্দ এখন ওর সঙ্গে আর শ্যামবাজার যায় না। এখন ওর সঙ্গে দেখা হয় নিত্য বিকেলে। ওইটেই পাকা বন্দোবস্ত হয়েছে। ওদের দেখা হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান এসপ্ল্যানেডে ট্রামের দোতলা ঘরটার নীচে। ওখান থেকে কোনদিন সিনেমায় যায়, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে। আনন্দ ওকে নিজের জীবনের কথা বলেছে। শ্যামলীও বলেছে। ওর জীবনের কথা আর কি ? শুধু দুঃখ

কষ্টের কথা। অপমানের কথা। আনন্দ একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল—ভালবাস নি কাউকে?

সেদিন গঙ্গার ধারে বসেছিল ওরা। কাজল খিল খিল করে হেসে বলেছিল—আমি তো দুনিয়াসুদ্ধ লোককেই ভালবাসতে চাই। কিন্তু কালো মূর্খ মেয়েকে ভালবাসতে দেয় কে? বন্ধুই জীবনের আমার একজন, প্রথম ও শেষ। সে তুমি! বান্ধবীও নেই। যাদের সঙ্গে হয়েছিল—তারা বিয়ে হয়ে কে কোথায় চলে গেছে। আমি পড়ে আছি একলা।

কাজলের ছবিও এঁকেছিল আনন্দ। কাজল তার সামনে বসে থেকেছে ছবি আঁকাবার জন্য। সে ছবি একজিবিশনে নাম করেছে, প্রাইজ পেয়েছে। সে বলে—আমি ধন্য হয়ে গেছি। কিন্তু তার জন্য আনন্দ তাকে টাকা দিতে চেয়েছিল সে নেয় নি। কিছুতেই নেয়নি।

বলেছিল—আমার রূপ নেই। ও রূপ যা ছবিতে তুমি দিয়েছ তা তোমার দেওয়া, তোমার সৃষ্টি। আমি ধন্য হয়েছি ছবি আঁকিয়ে। কিন্তু ওর জন্যে টাকা নিলে তোমার কাছে দাঁড়াতে পারব না। আমি কেনা হয়ে যাব।

—ছবিটা যে পাঁচশো টাকায় বিক্রী হয়েছে কাজল।

—তা হোক। তুমি বরং আমাকে একখানা শাড়ি কিনে দিয়ো।

শাড়ি সে নিয়েছে। কিন্তু সেও ছ'খানা এণ্ডির রুমাল তাকে উপহার দিয়েছে। সে তাকে ফুল দেয়, রুমাল দেয়, ছোটখাটো জিনিস নিতান্তই মূল্যের দিক থেকে নগণ্য—এ তাকে দেয়। মাটির পুতুল তার ভাল লাগলে তাও দিয়েছে।

কাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ওরা বেড়াচ্ছিল। একটু বেলা ছিল। আষাঢ় মাসের বেলা। বেলফুলের মালা, চাঁপাফুল, যুঁইয়ের গ'ড়ে বিক্রী হচ্ছিল। কাজল বলেছিল—আঃ, আজকাল যা আমার টবের গাছে ফুল দিচ্ছে কি বলব তোমাকে। এই বড় বড় এবং অজস্র ফুটছে।

সে খপ্ করে সুযোগটা ধরেছিল। না। ঠিক সুযোগ সে ধরে নি। সুযোগ সে নেয় না। হ্যাঁ—সঙ্কোচ একটা ছিল সেটা কাটিয়ে নিতে পেরেছিল। মানুষের জীবনে যেটা ন্যায্য পাওনা সেটা দাও বলবার একটা সময় আছে, সেই সময়টা এসেছিল অকস্মাৎ, শ্যামলীই যেন এনে দিয়েছিল সে সময়। সে বলেছিল বেলফুলের কথা—আজকাল যা আমার টবের গাছে ফুল দিচ্ছে কি বলব তোমাকে। এই বড় বড় এবং অজস্র।

সে বলে উঠেছিল—যা সেগুলি গর্তে ফেলে পচাচ্ছে তো!

—হ্যাঁ। আমি আর কি করব? আগে তোমার ওখানে দিয়ে আসতাম। এখন বরাবর চলে আসি।

—মালা গাঁথলেই পার।

—কি হবে?

—পরবে।

—মা ঝাড়ু মারবে।

—তা হলে পরাতে পার।

—পরবে? তুমি?

—বান্ধবী দিলে বন্ধু অবশ্য পরবে। বন্ধুত্বের মালা বন্ধনের নয়। পার পরাতে?

বক্র কটাক্ষ হেনে কাজল বলেছিল—পারি না? নিশ্চয় পারি! পরবে? আনব কাল!

—এনো। কালকের সন্ধ্যাটি হয়ে থাকবে স্মরণীয় চিরদিনের মতো। কথা রইল?

—কথা রইল।

—দেখব।

ওরা বাড়ী ফিরল একসঙ্গে কিন্তু নীরবে। কাজল দু'চারটে কথা যাও বললে—আনন্দ তার উত্তর দিলে না।

পাড়ায় এসে আনন্দের বাড়ীর সামনে দুজনে থমকে দাঁড়াল। আনন্দ বললে—কাল!

হেসে কাজল বললে—হাঁ কাল। কিন্তু তোমার কি হল বল তো? সারা পথ চুপ করে এলে।

আনন্দ বললে—কি হবে? ভাবছি কাল আমার বান্ধবীকে আমি কি দেব?

—তোমার দেওয়ার সীমা আছে?

—ওসব কথা কাল হবে।

—বেশ—বেশ। কাল। কাল! কাল! কাল!

—হাঁ কাল আমাদের চিরকাল স্মরণীয় থাকবে।

—আচ্ছা!

আনন্দ এসে ঘরে ঢুকল। কান তার ঝাঁ-ঝাঁ করছে। বুকের ভিতরটা স্পন্দিত হচ্ছে। ঘরে পায়চারি করতে করতে সে ডাকলে—হরিয়া!

হরিয়া এসে দাঁড়াল।—কি?

—অনেক দিন আগে বড় বোতল একটা ছিল। তাতে খানিকটা ছিল। ছিল না?

—হুঁ। আছে।

—দে সেটা।

প্রায় তিন মাস পর আনন্দ মদ খেল।

পরদিন সকাল থেকে কেমন অধীর হয়ে রইল সে। বিকেল ছ'টা কখন হবে। আজকের এই অধীর উল্লাস একটু বিচিত্র ধরনের। এমন সে কখনও অনুভব করে নি। কাজল তাকে মালা পরাবে। একটা যেন আশ্চর্য কিছু। মালা পরে কি করবে জানে না। কিছু করবে। এ যেন একটা গান—তাকে কেউ শোনাচ্ছে। সকাল থেকে—তাই বা কেন—কাল রাত্রি থেকেই কেউ শুরু করেছে গান।

জীবনের গান। জীবন তার ধন্য হয়েছে। একটি নারীকে সে জয় ক'রেছে। তার থেকে তার রূপান্তর হয়েছে। অন্ধকার রাত্রি এসে জীবনকে তিমির নিবিড় নিশীথিনীর মতো আবৃত করে তার সকল আবরণকে হরণ করে নিয়েছে। প্রভাত হয়েছে তবু সে আলো সে তিমির নিশীথিনীর যবনিকা ভেদ করতে পারে নি। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে সে সেই আদিম কালের মানুষের মতো অভিসারের জন্য সেজেছে। সন্ধ্যার জন্য জপ করেছে।

সারাটা দিন কোন কাজে মন বসে নি। শুধু মন আকৃষ্ট করতে পেরেছিল—চড়ুই

পাখীটা। আজ এই দু'মাসের মধ্যে সে পাখীটার দিকে মন দিতে পারে নি। তাকে সে ভুলেই গিয়েছিল। সে আছে, সে থাকত, উড়ত, ডাকত, বেরিয়ে যেত ফিরে আসত, ঘড়ি বাজবার সময় ঘরে থাকলে ঘড়িটার ব্র্যাকেটে ব'সে চিক-চিক করে ডাকত, ডায়েলে ঠোকরাতো। আনন্দ ঘরে থাকলেও তা দেখত কিন্তু সে ঠিক সেই দেখা নয়। হরিয়া ঘোরে ফেরে—সে যেমন দেখে—তেমনি। একটি করুণা ছিল কিন্তু তার বিশেষ কোন আবেদন ছিল না। যে ভিক্ষুক তার দুর্দশার জন্যে প্রথম দিন যে করুণা আকর্ষণ করে যে উত্তাপ তার মধ্যে থাকে, তার পরে সে যখন নিত্য এসে দাঁড়ায় তখন যেমন দান পেলেও তার সে সরসতা আর থাকে না—এ তেমনি। আজ সকালে দীর্ঘদিন পর সে চড়ুইটাকে অবলম্বন করেই দিনটা কাটিয়ে দিয়েছিল। অনেক রসিকতা অনেক কথা সে তার সঙ্গে বলেছিল। দুপুরবেলা একটু শুয়েছিল। কিন্তু আধঘণ্টা অন্তর তার ঘুম ভেঙেছে। ক'টা বাজল। ঘড়ির দিকে তাকাবার আগে কান পেতে শুনেছে মৃদু চিনিক চিনিক শব্দ উঠছে কিনা। চড়ুই পাখীর ঘড়ির দরকার নেই। তার ঘুম ঠিক সময় ভাঙে। চড়ুইটার প্রথম চিনিক ডাক শুনেই সে উঠে জানালা খুলেছিল। রোদ তখনও ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ঘড়িতে তিনটে বাজতে দশ মিনিট। তার পরও আড়াইঘণ্টা। হঠাৎ তার নজরে পড়েছিল চড়ুই সখীর সখা জুটেছে। এর মধ্যে চড়ুই পাখীর ডিম হয়েছিল কিন্তু ডিম দুটো ভেঙে গেছে। সখার সঙ্গে তার খেলা দেখে তার নেশা লেগেছিল।

পাঁচটার সময় বেরিয়েছিল সে তার সব থেকে সুন্দর পোশাকটি প'রে। দোকান থেকে পাখা এসেছে। হরিয়া বলেছিল, ওটা খাটাই। সিলিং ফ্যান একটা। টেবিল ফ্যানটায় চলছে না।

সে বলেছিল—থাক আজ। আজ সময় নেই আমার। কাল আসতে বলে দে।

পৌনে ছটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এসপ্লানেডে ট্রাম টার্মিনাসে। অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল ট্যাক্সি নিয়ে যায় উইলিয়ামস্ কোম্পানির আপিসে। কিন্তু কাজল বলেছে—না। আপিসে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না। আমার লজ্জা তোমাকে নিয়ে নয় অন্য জনের কথা সইবে না।

ছটা বাজতে পাঁচ মিনিটেই এসেছিল কাজল। তার পোশাকও ছিল আনন্দের রুচিমত, তারই দেওয়া। গাঢ় লাল ব্লাউজ, ফিকে নীল পাড়হীন শাড়ি। হেসে বলেছিল—এসেছি।

সেও বলেছিল—আমি অনেক আগে এসেছি নেবার জন্যে।

নীরবে পথ চলেছিল। কথা যেন মনে মনে চলছে। অন্ততঃ—চল। আনন্দের তাই মনে হয়েছিল। এসে বসেছিল গঙ্গার ধারে নির্জনে। হাঁটতে হাঁটতে যেতে অন্ধকার হয়ে এসেছিল। অনেকটা দূর গিয়েছিল। যেখানেই দাঁড়ায় সেখানেই যেন মানুষ। কখনও সে বলেছে—আর একটু চল। কখনও কাজল বলেছে—এখানে ওই সব লোক রয়েছে। শেষে মনের মতো নির্জন জায়গা পেয়ে বসেছিল দুজনে।

—এই নাও। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটি অ্যালুমিনিয়মের কৌটো থেকে বের করে খুলেছিল কৌটো। মুহূর্তে মধুর গন্ধে ভরে উঠেছিল আনন্দের নিশ্বাস। মালা বের করে.

বলেছিল—

—নাও, পর।

—না। তুমি পরিয়ে দাও।

—আনন্দ!

—কি?

—না, তুমি পর।

—না। পরিয়ে দাও। নইলে দাও আমি তোমায় পরিয়ে দি! নইলে থাক।

—বাবাঃ! আচ্ছা জেদী লোক তুমি। যা ধরবে তুমি ছাড়বে না। পরিয়ে দিয়েছিল মালা সে তার গলায়।—বলেছিল ধন্য বন্ধু।

—এবার আমি পরিয়ে দি।

—না। তুমি প'রে থাক। আমি সেইজন্যে গেঁথেছি।

—না।

—না।

মুহূর্তে উদ্দাম আবর্ত বাঁধভাঙা জলের মতোই যেন কল্লোল তুলে ছুটেছিল বুক তোলপাড় ক'রে। সে দুই হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য! কাজল আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠেছিল—আনন্দ!

—চুপ কর, চেঁচিয়ো না। কাজল।

কিন্তু সে থামে নি, আর্তকণ্ঠেই বলেছিল—আনন্দ। না না না। দুহাত দিয়ে তার মুখ ঠেলে দিয়েছিল। নিজেকে ছাড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু আনন্দ তাকে ছাড়তে চায় নি! অকস্মাৎ কি ক'রে একটা হাত ছাড়িয়ে কাজল তাকে চড় মেরেছে, থামচে দিয়েছে। প্রায় চীৎকার করে উঠেছে।

ঘাটের উপর মোটরের থামবার শব্দ হয়েছিল এই মুহূর্তটিতে। ছেড়ে দিয়েছিল আনন্দ। কাজল উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল। ছি—ছি—ছি! ছি তোমাকে! বলে সে অন্ধকারের মধ্যেই কাপড় ঠিক করে নিয়ে হন্ হন্ করে ঢাল থেকে উপরে উঠে এসেছিল। আনন্দ কয়েক মুহূর্ত পর উঠে তার পিছন ধরেছিল। সে এর শোধ নেবে। কিছুদূর এসেই গঙ্গার ধারে জনসমাগমের মধ্যে কাজল মিশে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চলে এসেছিল একটা ট্যাক্সি ধরে। এসে উঠেছিল বারে। বারে মদ খেয়ে সে গোটা ময়দান ঘুরেছে ট্যাক্সিতে কাজলের সন্ধানে নয়। অন্যের সন্ধানে। যবনিকা পড়ুক। মাথায় আগুন জ্বলছে। ফিরেছে রাত্রে। রাত্রি প্রায় বারোটা। কাজলদের পাড়ার রাস্তাটার মোড়ে গাড়িকে থামতে বলে সে নামতে গিয়ে দেখল পা ঠিক নেই। তা ছাড়া রাত্রি বারোটা। বললে—চলো। থোড়া দূর। বাঁয়ে রাস্তেসে।

হরিয়া তাকে ধরে নামালে। শুইয়ে দিলে। আনন্দ বললে—শুইয়ে দে।

হরিয়া শোওয়াতে গিয়ে বললে—সে এসেছিল।

—কাল শুনব। আজ যেতে বলে দে।

সকালে উঠল সে ক্ষোভে ক্রোধে জ্বালাধরা অন্তর নিয়ে। সমস্ত কিছুর প্রতি নিষ্ঠুর আক্রোশে তার মন ভরে উঠেছে। ভুল! সে ভুল করেছে এতদিন। সকালবেলা চা দিতে এসে হরিয়া বললে—কাল রাতে সে এসেছিল। চিঠি লিখে গেল। বললে, বাবুকে দিয়ো।

—চিঠি? কে? কে লিখে গেছে—কে?

লেখা দেখে মনটা আরও জ্বলে গেল। কাজল, না শ্যামলী। সেই কালো ভিখিরী মেয়েটা। সে-ই। তিরস্কার করেছে। হয়তো ভয় দেখিয়েছে। ছিঁড়ে ফেলে দিতে গেল সে। কিন্তু কি ভেবে সে খুললে—চিঠিখানা খুললে। কি লিখেছে সে।

প্রিয়তম আনন্দ,

আত্মহত্যা ছাড়া আমার পথ নেই। ভুল করেই, হয়তো অভ্যাসবশে তোমাকে বাধা দিয়েছিলাম। নিজেকে ছাড়িয়ে তোমাকে আঘাত করেছিলাম। পালিয়ে এসেছিলাম। এসপ্লানেডে এসে বুঝতে পারলাম তোমাকে হারাচ্ছি আমি। তোমাকে হারিয়ে কি করে বাঁচব আমি? এই ভালবাসা তো কাউকে বাসি নি আমি। বিশ্বাস কর। আমাকেও তুমি ছাড়া কেউ দয়া করে তো ভালবাসে নি। ভোগ হয়তো করতে চেয়েছিলো। কিন্তু বাবার কাছে শিক্ষায় তা পারি নি। সে আত্মহত্যা। সেই কারণেই, সেই অভ্যাসেই আজ তোমার প্রতি এমন রূঢ় হয়েছি। কিন্তু তারপর? তোমাকে হারিয়ে কি করে বাঁচব? বুঝতে পারছি, নিশ্চয় বুঝছি তোমাকে হারিয়ে বাঁচতে পারব না আমি! আত্মহত্যা করতে হবে। বাঁচতে না পারলেই আত্মহত্যা করতে হবে। তাই ভেবে ফিরে তোমার বাসায় এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, বলব—আমাকে নাও। যা ইচ্ছে হয় কর। আমি ঢেলে দিলাম নিজেকে। আত্মহত্যা যদি করতে হয় আনন্দ তা হলে তোমাকে পেয়েই মরব। সে মরণে সুখ পাব। কিন্তু তুমি ফিরলে না। আজ করে যাচ্ছি। কাল আসব। আত্মসমর্পণ করতে আসব। দুপুরবেলা আসব। তুমি বাসর সাজিয়ে রেখো—এটা আমার সাধ।

—কাজল।

আনন্দের ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মন আক্রোশে পরিতৃপ্তিতে উল্লাসে ভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা বাসনা যেন ফেনিল হয়ে উঠল। সে আসবে। সে আসবে। এই জীবন। দিস্ ইজ লাইফ।

—হরিয়া!

—আঁ।

—মিস্ত্রী ডাক। পাখাটা টাঙা। আমি আসছি।

সে বেরিয়ে গিয়ে বাজার থেকে কিনে আনলে ফুল, নতুন বিছানার চাদর বালিশ। কিনে আনলে মদ! হয়তো কাজল শেষ মিনতি করবে। বলবে বিয়ে কর! না। মদ খেয়ে সে শক্ত হবে। উল্লসিত হল। ট্যাক্সিতে বসেই সে মদ খেলে খানিকটা। একটুক্ষণের মধ্যেই মাথাটা রমরম করে উঠল। ঘরে ঢুকে হরিয়াকে বললে—নতুন চাদর পাত! ফুলগুলো সে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিলে। হরিয়াকে বললে—খাবার শিগ্‌গির তৈরি কর।

—বেরুবে?

—না।

—দশটার পর কাজল আসবে। বুঝলি? তুই আজ দুপুরে সিনেমায় যাবি।

সে আসবে! সে আসবে! সে আর একটু মদ খেলে।

বেলা বারোটার সময় সে খেয়ে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল। মাথায় নতুন সিলিং ফ্যান, নতুন শয্যা। চারিদিকে রজনীগন্ধার ঝাড়। সে আসবে। আয়নায় নিজেকে দেখলে। থম থম করছে তার মুখ। প্রদীপ্ত উল্লাসে উগ্র হয়ে উঠেছে। উঠুক। সে পুরুষ। নীল আলোটা জ্বেলে ঘরের জানালা বন্ধ করে দিল সে। নীলাভ অন্ধকার হোক। ঘরটা ঠাণ্ডা হোক। অকস্মাৎ শব্দ উঠল—

—চি-রি-ক। চি-ক-চি ক! চিক।

পাখার ক্রর্‌র্‌ শব্দ তুলে চড়ুইটা বাসা থেকে বেরিয়ে ঘরময় উড়তে লাগল।

এসে বসল কোণে। সেখান থেকে উড়ে হোল্ডারে। সেখান থেকে ঘরময় বেড়াতে লাগল—আতঙ্কিতের মতো। এখনও ওর জানালা বন্ধের সময় হয় নি। ও বাইরে যাবে। হঠাৎ তার মাথায় এসে ধাক্কা খেলে। কিন্তু সেবারের মতো নয়। সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে গেল। উড়তে লাগল—

সে আসবে। চড়ুইটার উপর নিষ্ঠুর আক্রোশ হল তার। সে এক পা এগুলো জানালা খুলে দিতে। পরমুহূর্তেই ঘুরল। আপদ! জ্বালালে! দীর্ঘদিন থেকে জ্বালাচ্ছে। সে ঘুরে এগিয়ে গেল এবং পাখার সুইচটা টিপে দিলে। বোঁ-ও শব্দে ঘুরে উঠল পাখাটা। প্রথমে ধীরে তারপর জোরে। পাখীটা দিশাহারার মতো উড়ছে। পাখাটা নতুন। সে এক ভয়। উড়ছে। আনন্দ তাকিয়ে আছে। খট ক'রে একটা শব্দ হল। তারপর একটা পিন্‌ কুশন মাটিতে পড়ার শব্দ। পড়েছে। মদের উত্তেজনায় উত্তেজিত আনন্দ—পাখীটাকে কুড়িয়ে নিলে। থরথর করে কাঁপছে পাখীটা। তার সেই স্পন্দন আনন্দের শিরায় স্নায়ুতে যেন কেমন অস্বস্তিকর ঠেকছে। সে টিপে ধরলে। ঠোঁটের উপর নিজের দাঁতও টিপে বসল সঙ্গে সঙ্গে। সোজা হয়ে উঠতে গিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ও কে? ও কে? ওই আয়নার মধ্যে! আদিম অরণ্যচারী হিংস্র মুখ রেখায় রেখায় বীভৎস। ও কে? আনন্দ!—এই জন্তুটা তার মধ্যে ছিল। এই জন্তু সে! এমন জন্তু? তার হাতখানা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। পাখীটার রক্ত! গরম। বড় বেশি গরম। এত গরম! ভয় পাচ্ছে আনন্দ আয়নার মধ্যে মূর্তিটা দেখে। নীলাভ অন্ধকারের মধ্যে ওই ভয়ঙ্কর হিংস্র মানুষ,—ওঃ! সে চোখ বন্ধ ক'রে বার বার মাথা ঝাঁকি দিয়ে যেন সজোরে সবেগে অস্বীকার ক'রে বললে—না—না—না।

—হরি!

চমকে উঠল আনন্দ।

পরমুহূর্তে আবার ডাক এল—আনন্দ!

আনন্দ মরা পাখীটা হাতে দাঁড়িয়ে আছে বীভৎস—রক্তাক্ত হাত, মরা পাখীটার চোখ

দুটো আশ্চর্য কালো এবং করুণ। ওঃ!

—আনন্দ, আমি এসেছি।

আনন্দ আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—না—না—না। ফিরে যাও। তুমি ফিরে যাও! আনন্দ পাগল হয়ে গেছে ভয়ে, দুরন্ত ভয়ে!

—রাগ করোনা তুমি আনন্দ!

আনন্দ চীৎকার করে বললে—না—না—না।

হঠাৎ সে থেমে গেল। দৃষ্টি শূন্য হয়ে গেল।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল রবিবর্মার একটা ছবির কথা। ছেলেবেলায় দেখেছিল। জটায়ুবধ। রাবণের হিংস্র নিষ্ঠুর দম্ভর ভঙ্গিতে পৈশাচিক আনন্দ; চোখে ক্রোধ, নিষ্ঠুর কৌতুক হাতে তলোয়ার; জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ করেছে, বিরাট জটায়ু পড়েছে। বেপথু সীতা কাঁপছে।

সে কি রাবণ? চড়ুইটা কি ছোট থেকে বড় হয়ে উঠেছে? প্রকাণ্ড বড়? জটায়ু? ও ঘরে কাজল থর থর করে কাঁপছে?

না—না। সে রাবণ? হতে পারে না। পারবে না। রামও হতে চায় না। কাজলও সীতা নয়। কিন্তু পাখীটা—

পরমুহূর্তে হাতের মরা পাখীটার দিকে সে তাকাল। আঃ মেরে ফেললে সে? এমন নিরীহ জীবটাকে অবলীলাক্রমে মেরে ফেললে! কি ক'রে মারলে? কিন্তু এ কি? অকস্মাৎ তার এ কি হল। হু হু করে জল বেরিয়ে আসছে। অজস্র অশ্রু। একটা ছোট পাখীর এত রক্ত?

ওদিকে বাইরে একটি ক্যাঁচ শব্দ উঠল। বেরিয়ে যাচ্ছে সে। সে ডাকলে—কাজল! কাজল! আবেগ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ধরা গলায় উঠছে বুকের মধ্যে।

—আনন্দ।

দরজা খুলে দিলে আনন্দ। কাজল বাইরে দাঁড়িয়ে।

—তুমি কাঁদছ আনন্দ!

—পাখীটাকে মেরে ফেললাম কাজল।

—তার জন্যে কাঁদছ?

—কাঁদছি।—

অবাক হয়ে গেল কাজল। কি বলবে ভেবে পেলে না।

আনন্দ চোখ মুছে বললে—শোন।

—কি?

—তুমি বাড়ি যাও কাজল এখন। না। চল আমি তোমার সঙ্গে তোমার মায়ের কাছে যাই। তোমায় চেয়ে নিয়ে আসি। আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো কাজল? বন্ধুত্ব নয়। বিয়ে। যে বিয়েতে মৃত্যু পর্যন্ত বিচ্ছেদ নেই।

কাজল এবার কেঁদে ফেলল। নীরব অশ্রু। দরদর ধারায় তার সারা মুখ ভেসে যেতে লাগল। আনন্দ কি বিচ্ছেদহীন মিলনের কল্পনায় বিভোর হয়ে উঠেছে!